নিঝুমরাতের আতঙ্ক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

www.boiRboi.blogspot.com

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.94@gmail.com
Date: 2011.03.23 07:29:24 +06'00'

নিঝুমরাতের আতঙ্ক

স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে একগাল হেসে গজপতি আঙুল তুলে বললেন—ওই যে জঙ্গলমতো জায়গা দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই। সূর্য ডুবতে চলেছে, শিগ্‌গির পৌঁছতে হবে কিন্তু।

ভবভূতি ট্রেনটা চলে না-যাওয়া অব্দি কোন কথা বললেন না। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠোঁটের কোনায় সেই অবিশ্বাসের বাঁকা হাসিটা এখনও রেখে দিয়েছেন অবশ্য। ট্রেনটা দূরের বাঁকে গাছপালার আড়ালে মিশে গেলে তখন বললেন—ইয়ে, একটুখানি চা পেলে ভাল হত।

—চা! গজপতি হাসলেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখ তো, এখানে চায়ের দোকান দূরের কথা, আমরা বাদে জনমনিষ্যি আর দেখতে পাচ্ছ নাকি?

ভবভূতি দেখলেন। তাই বটে। প্ল্যাটফর্ম খাঁ খাঁ। শুধু এই স্টেশনঘর—তার মানে একটা টিনের গুমটিঘরের মতো, তাছাড়া আর কোন ঘরবাড়িও নেই। গাছপালা ঝোপজঙ্গল নিঝুম হয়ে ঘিরে আছে স্টেশনটা। কেমন যেন থমথমে অস্বস্তিকর হাবভাব।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ঝোপের আড়ালে দুজন লোক হনহন করে চলে যাচ্ছে। অমনি ভবভূতি বলে উঠলেন—ওই তো দুজন লোক।

গজপতি তা দেখে নিয়ে বললেন—হুঁ, এই স্টেশনেরই লোক। স্টেশনমাস্টার আর পয়েন্টসম্যান। কিন্তু ওরা পালাচ্ছে।

—পালাচ্ছে, মানে? ভবভূতি অবাক!

—স্টেশনে থাকতে চায় না। গজপতি জানালেন। রেলের

কোয়ার্টার পর্যন্ত এখানে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। করেছে খানিকটা দূরে। ওরা এখন পালিয়ে সেই কোয়ার্টারে ঢুকবে। পরের ট্রেন আসার সময় হলে স্টেশনে আসবে। ফের পালাবে।

অবিশ্বাসী ভবভূতি বললেন—তাহলে এই স্টেশনঘরটা তৈরি হল কীভাবে শুনি?

সে অনেক হাঙ্গামা করে হয়েছিল। সায়েব ইঞ্জিনিয়াররা এসে বানিয়েছিল। ওরা খুব ডানপিটে ছিল বলেই পেরেছে। গজপতি পা বাড়িয়ে ফের বললেন—আর ট্রেনটা কেমন ঝটপট একটু দাঁড়িয়েই তক্ষুণি লেজ তুলে কেটে পড়ল, দেখলে না? তুমি ঠাহর করলে দেখতে, ড্রাইভার-ফায়ারম্যান-গার্ডসায়েব—এমন কি যাত্রীরাও এ স্টেশনে এসে চোখ বুজে থাকে! ওই সিগনাল পেরুলে তখন চোখ খোলে।

—আমরা কিন্তু চোখ বুজে নেই। ভবভূতি বাঁকা হাসিটা আরও একটু লম্বা করে দিলেন।

গজপতি বললেন—আমাদের ক্ষতি হবার কারণ নেই বলেই চোখ খুলে রেখেছি। তুমি নিশ্চিন্তে থেকো, আমাদের গায়ে আঁচড় লাগা দূরে থাক, আমাদের উঁকিঝুঁকি মেরে ওরা দেখতে সাহসও পাবে না। কারণ এত বড় প্রজেক্টের চার্জে আছে আমার ভাগ্নে ভূতনাথ। ভূতনাথকে ওরা কী ভয় যে পায়!

প্রজেক্ট। অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে 'প্রকল্প'। এই প্রকল্পের কথা শুনে ভবভূতি কলকাতায় গজপতির ড্রয়িংরুমে যতটা জোরে হেসেছিলেন, এখানে পৌঁছে ততটা পারলেন না। খুকখুক শব্দ হল মাত্র। গজপতির পিছনে-পিছনে রেললাইন বরাবর এগোতে থাকলেন। সূর্য গাছপালার আড়ালে অস্ত যাচ্ছে। আশ্বিন মাস। ঘন সবুজ চেকনাই দেওয়া। সেইসব গাছপালার গায়ে নীলচে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। পাখপাখালি তুমুল হল্লা করছে। ভবভূতি টের পেলেন, কেমন যেন অস্বস্তি তাঁকে পেয়ে বসছে ক্রমশ। হলেও-হতে-পারে কিংবা থাকলেও-থাকতে পারে গোছের

ভাবনা মগজে সুড়সুড় করে বেড়াচ্ছে। বারবার এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

এই প্রকল্পের কথাটা উঠেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের কথায়। গতকাল সন্ধ্যায় জোর বৃষ্টি নেমেছিল। রাস্তায় একহাঁটু জল জমে গিয়েছিল। তার সঙ্গে লোডশেডিং। গজপতির ড্রয়িংরুমে মোম-বাতির আলোয় বাঘ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভবভূতি যৌবনে দুর্দান্ত শিকারী ছিলেন। তাই ওঁর সব কথায় বাঘ আসবেই। ওঁর আফসোস, বাঘ মেরে বড্ড ভুল করেছেন এতকাল। এখন বাঘবংশ দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। তাই সুন্দরবনে বাঘ প্রকল্প করে সরকার একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। বেচারিরা শান্তিতে ওখানে খেয়েপরে বাঁচুক আর বংশবৃদ্ধি করুক।

সেই কথার জের টেনে গজপতি বলেছিলেন—আর ভূতবংশের কথাটা ভাবো ভায়া! আজকাল আর তত ভূত কেউ দেখতে পায়? ভূতেরাও তো লোপ পেতে বসেছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি…

বাধা দিয়ে ভবভূতি বলেছিলেন—ভূত! তুমি ভূত বিশ্বাস কর?

—আলবৎ করি। গজপতি দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়েছিলেন। সেই তো বলতে যাচ্ছি!

হাত তুলে ভবভূতি বলেছিলেন—উঁহু, শুনব না! সব গুল। ভূত নেই।

—নেই! গজপতি ফুঁসে উঠেছিলেন। আলবৎ আছে। চলো, এক্ষুণি চলো—আছে না নেই টের পাইয়ে দিচ্ছি।

—কোথায় যাব শুনি? ভবভূতি হাসতে হাসতে বলেছিলেন। কোনও পোড়ো বাড়িতে, নয়তো শ্মশানে—এই তো? আমি ওসব জায়গা চষে ফেলেছি একসময়। ভূতের টিকিও দেখিনি।

গজপতি রেগে গিয়েছিলেন।—ঠিক জায়গায় গেলে তো দেখবে। তাছাড়া বললুম তো, আজকাল আর তত ভূত নেই। আগে যেমন

পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন বাঘ দেখা যেত, এখন কি যায়? যায় না। আর তুমিই তো বললে, বাঘবংশ লোপ পাচ্ছে বলে সুন্দরবনে বাঘ প্রকল্প করা হয়েছে।

—হয়েছে। প্রকল্প না বলে বলো, বাঘেদের অভয়ারণ্য।

—হুঁ, ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলুম তোমায়। শুনবে, না খালি গোঁ ধরবে। রামচন্দ্রপুর নামে স্টেশন আছে শুনেছ কখনও? শোননি।

ভবভূতি বাঁকা হেসে বলেছিলেন—না শুনিনি। তা হয়েছে কী?

—রামচন্দ্রপুরে ঠিক তোমার সুন্দরবনের বাঘেদের অভয়ারণ্যের মতো ভূতেদেরও বংশরক্ষার জন্য অভয়ারণ্য করা হয়েছে জানো? আর তার প্রজেক্ট অফিসার কে জানো?

—জানি না। কারণ এমন প্রজেক্টের কথা কস্মিনকালে শুনিনি।

গজপতি গর্জে বলেছিলেন—তুমি যা জানো না বা শোননি, তা নিয়ে তক্কো করতে এসো না। রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্পের চার্জে যে অফিসার আছে, তার নাম ভূতনাথ; আমার আপন ভাগ্নে। সে রীতিমতো মেক্সিকোতে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ভূতের ব্যাপারে।

ভবভূতি অবাক হয়ে বলেছিলেন—বলো কী!

—হ্যাঁ। মেকসিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূততত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। আমাদের ভুতো সেই ডিগ্রি পেয়ে এখন ভারতের নামকরা ঘোস্ট-এক্সপার্ট অর্থাৎ ভূত-বিশেষজ্ঞ হয়েছে। গতবছর যখন রামচন্দ্রপুর ঘোস্ট প্রজেক্ট—থুড়ি, ভূতেদের অভয়ারণ্য চালু হল, তখন তার উদ্বোধন করেছিলেন কে জানো তো? ভূত বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মিসেস এস সি হাড়মট্‌মটিয়া।

ভবভূতি আরও অবাক।—এমন সরকারি দফতরের নাম তো শুনিনি! আর এস সি হাড়মট্‌মটিয়া…উঁহু, শুনিনি।

গজপতির উল্লাস দেখে কে!—এই তো! কিছু খবর রাখো না। রাখবে কী করে? সারাজীবন তো বনবাদাড়ে বাঘের লেজ ফলো করেই কাটালে। শুনে রাখো, এমন দফতর একটা আছে। তবে গোপনীয় দফতর। তাই কেউ জানে না। আমার ভাগ্নের খাতিরেই আমি জেনেছি।

—হুঁ। তাহলে ওই মন্ত্রীমহোদয়ার পুরো নাম বুঝি মিসেস শাঁকচুন্নী হাড়মট্‌মটিয়া? ভবভূতি ফের হেসে উঠেছিলেন।

গজপতির আবার রাগ হয়েছিল। বলেছিলেন—ঠিক আছে। কালই আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো। রামচন্দ্রপুর ভূতারণ্যে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখবে। এও বুঝবে, স্টেশনের নাম রামচন্দ্রপুর রাখার কারণই বা কী?

কী কারণ শুনি?

—ওটা ভূতারণ্যের বর্ডার। রাম শব্দে ভূতেরা জব্দ। বুঝলে না? পাছে অভয়ারণ্য বা ভূত প্রকল্পের দু-একটা পাজি ভূত এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে গাঁ-গেরামে গিয়ে হানা দেয়, তাই ওই ব্যবস্থা। তোমার সোঁদরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দু-একটা বাঘ কি এমন করে না মাঝে মাঝে?

রেল লাইনের ধারে-ধারে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে সরু একফালি রাস্তায় নামলেন গজপতি। সামনে একটা ছোট্ট নদী দেখা যাচ্ছিল। তার ওপর কাঠের পোল আছে। সেই পোলে পৌঁছবার পর বললেন, এবার আমরা ভূতেদের অভয়ারণ্যের এলাকায় ঢুকছি। ওই দেখ, কাঠের ফলকে লেখা আছে: 'রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্প'। দেখতে পাচ্ছ তো?

ভবভূতি থমকে গেলেন। মুখের বাঁকা হাসিটা মিলিয়ে গেল। কাঠের ফলকটার সামনে দাঁড়িয়ে চশমা খুলে চোখ দুটো মুছে নিলেন। তারপর চশমার কাচ ভালভাবে মুছে হেঁট হলেন। কিন্তু না। বড় বড় হরফে সত্যি লেখা আছে: 'রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্প'। এবং তলায় ব্রাকেটের মধ্যে: তেরটি প্রজাতির ভূতের অভয়ারণ্য। তার পাশে আরেকটা বড় ফলকে নোটিশ:

'সাবধান, কেহ উহাদের উত্ত্যক্ত করিবেন না। ঘাড় মটকাইয়া দিলে সরকার দায়ী হইবেন না। তবে কেহ কেহ আদর করিয়া উহাদের কিছু খাওয়াইতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু

নীচের এই তালিকার খাদ্যগুলি ছাড়া আর কোন প্রকার খাদ্য খাওয়াইবেন না। জরিমানা করা হইবে।'...

ভবভূতি একটু ঝুঁকে খাদ্য তালিকায় ঝটপট চোখ বুলিয়ে নিলেন। (১) দুধ (২) রসগোল্লা (৩) হাড়গোড় (৪) শুকনো গোবর (৫) খাঁটি সরিষার তৈল (৬) পাকা কলা (৭) টিকটিকির ডিম ও লেজ (৮) নানা রকম মাছ (সিঙ্গি বাদে) (৯) আরশোলার ঠ্যাং....

গজপতি ওঁর পিঠে হাত রেখে চাপাস্বরে বললেন—দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেল। আমার ভাগ্নের অফিসে গিয়ে ওসব জেনে নেবে। এস।

ভবভূতি গুম হয়ে গেছেন। মুখে রা-বাক্যি নেই। তার ওপর গজপতির একরকম চাপাগলায় কথা বলা শুনে তাঁর গা ছমছম করছে এবার।

দুধারে ঘন ঝোপজঙ্গল, মাঝখানে একফালি পিচের পথ। কিছুটা চলার পর বড় বড় গাছের জঙ্গল দেখা গেল। তার মধ্যে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। গজপতি তেমনি চাপাগলায় বললেন—ওই যে শ্রীমানের অফিস। মানে আমার ভাগ্নের।

ভবভূতি এখন মোটামুটি অনেকটা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। খুঁতখুঁতে গলায় বললেন—ওদের জন্যে কিছু খাবার আনা উচিত ছিল।

গজপতি ঠোঁচে আঙুল রেখে বললেন—চুপ! খাবারের নাম করো না। এক্ষুণি পিছু নেবে। সেবারে আমি কী বিপদেই না পড়েছিলুম এসে।

—পিছু নিয়েছিল নাকি?

—হুঁউ। ওই অফিস অব্দি পিছনে খালি বলে, 'কী এনেছিস, দিঁয়ে যা'।

—বলো কী! আচ্ছা, ওরা নাকিস্বরে কথা বলে কেন বলো তো?

—নাক নেই যে! কংকালের মুণ্ডু দেখনি? নাক আছে?

—ঠিক বলেছ। নাকের জায়গায় গর্ত আছে বটে।

এই সময় আলো অনেকটা কমেছে। ভবভূতি অস্বস্তিতে হাঁটছেন। আর অনবরত এদিক-ওদিক চাইছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো সামনে বাঁদিকে একটা গাছের প্রকাণ্ড মরা ও শুকনো ডালে কালোরঙের এবং দেখতে কতকটা হনুমানের মতো, কী যেন বসে আছে। তারপর সেই অদ্ভুত প্রাণীটা বারকতক আপন খেয়ালে উল্লুকের মতোই শুকনো ডালটা ধরে চরকিঘোরা হয়ে ঘুরল। ভবভূতি শিউরে উঠে বললেন—ওটা কী?

গজপতি দেখেই চাপাস্বরে বললেন—বলো রাম রাম রাম রাম—

ভবভূতি আওড়াতে শুরু করলেন—রাম রাম রাম রাম রাম—

সাবধানে পা টিপেটিপে জায়গাটাপেরিয়ে গিয়ে গজপতি জানালেন—এই প্রজাতির নাম 'গেছো'। এরা গাছে থাকে। এদের বড্ড বদ অভ্যেস। টুপটাপ করে ঢিল ছোড়ে। মাথা ন্যাড়া দেখলে তো আর রক্ষে নেই।

রাস্তাটা ডাইনে ঘুরছে এবার। সামনে গেট দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে বাংলো মতো একটা বাড়ি। গেটের কাছাকাছি যেতেই ভবভূতি দেখলেন, আচমকা কী একটা ঢ্যাঙা লিকলিকে মূর্তি সটান ঝোপ ঠেলে রাস্তায় এল এবং তাঁদের সামনে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গেল। ভবভূতি ফিসফিস করে উঠলেন—গজু! ওটা কী?

গজপতি দাঁড়িয়ে গেছেন। তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন—এই সেরেছে। কিছু খাবার আনা উচিত ছিল। তাই তো! অন্তত একটুখানি শুকনো গোবর ...

মুখের কথা মুখেই থাকল গজপতির, সেই মূর্তিটা হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে বেজায় হেসে উঠল। ভবভূতি বিড়বিড় করতে থাকলেন—ট্রাম ট্রাম ট্রাম ট্রাম...

তারপর টের পেলেন রামের বদলে ট্রাম বলছেন। তারপর শুধরে নিয়ে রামনাম শুরু করলেন। আর গজপতি বিকট চেঁচিয়ে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন—ও ভূতো-ও-ও, ভূতো রে-এ-এ! তোর

www.b...blogspot.com

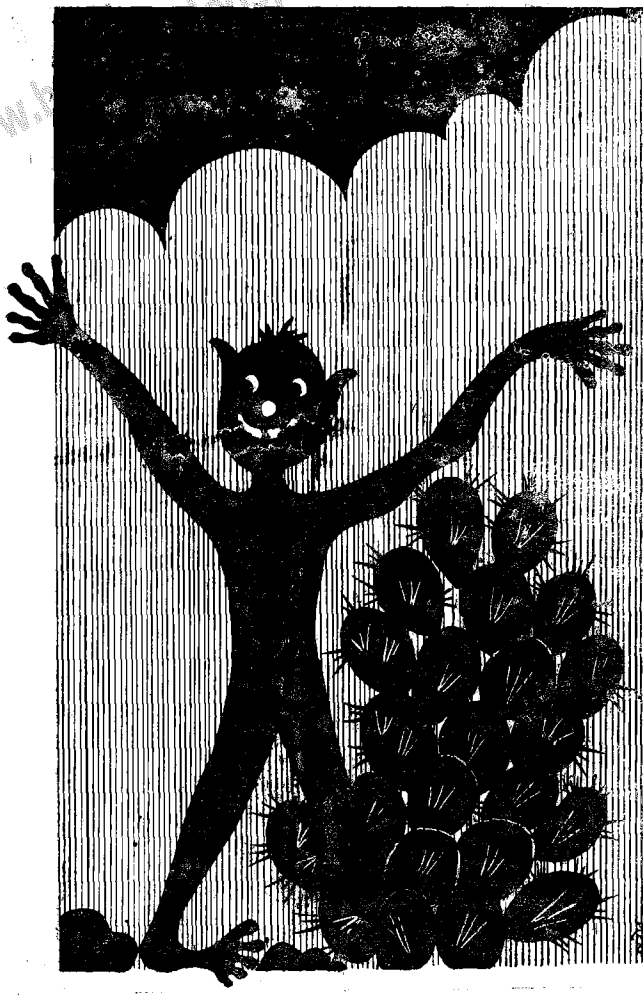

…কী একটা ঢ্যাঙা লিকলিকে মূর্তি সটান ঝোপ ঠেলে (পৃঃ ১৩)

ঘটোৎকচকে সামলে নে! বেরিয়ে পড়েছে-এ-এ!

বাংলো বাড়ি থেকে আলো হাতে বেরিয়ে কে সাড়া দিল—কোন্ বেটারে? নাম ধরে ডাকছিস! স্পর্ধা তো কম নয়।

গজপতি বললেন—বাবা ভূতো, আমি—আমি। তোর মামা গজপতি।

আলো হাতে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল একটা লোক। তাকে দেখে রাস্তা আটকে দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা একলাফে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আচমকা যেন ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। গজপতি ফিসফিস করে জানালেন—পাহাড়ী দেশের ভূত, বুঝলে তো? তারপর ভবভূতির হাত ধরে পা বাড়িয়ে বললেন—বাবা ভূতো, তোকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি। এদিকে ট্রেনটাও লেট করেছিল।

গেট খুলে ডঃ ভূতনাথ বললেন—মামা নাকি? আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য। উনি কে?

—আমার বন্ধু ভবভূতি পতিতুণ্ডু। তোকে এনার কথা বলেছি, মনে নেই হয়তো। ইনি একসময় নামকরা শিকারী ছিলেন। আর ভবভূতি, এ হচ্ছে সেই ডঃ ভূতনাথ পাত্র।

ডঃ ভূতনাথ নমস্কার করে বললেন—আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য!...

বাংলোঘরের মধ্যে একটা হ্যাজাগ জ্বলছে। লণ্ঠনটা দম কমিয়ে বারান্দায় রেখে ডঃ ভূতনাথ ওঁদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। কোনার টেবিলে একটা কালো বেঁটে মোটাসোটা হাঁড়িমুখো লোক খাতায় কী সব লেখালেখি করছিল। একবার মুখ তুলে দেখল। ভবভূতির গা শিরশির করে উঠল লোকটাকে দেখে। মানুষ বটে তো? কেমন যেন ভুতুড়ে চেহারা।

পাশের ঘরের দরজা খুলে ডঃ ভূতনাথ বললেন—এক মিনিট। মোমবাতিটা জ্বেলে নিই।

ভবভূতি বললেন—লোডশেডিং বুঝি ?

—না। এখানে ইলেকট্রিসিটির বালাই নেই! কেন নেই, পরে বলব'খন।...বলে ডঃ ভূতনাথ মোমবাতি জ্বেলে দিলেন। ডাকলেন—আসুন মামা! আপনারা ভেতরে এসে বসুন। আমি চায়ের যোগাড় করি।

ঘরটা বেশ বড়। ভবভূতি ও গজপতি আরাম করে বসলেন। ডঃ ভূতনাথ বাইরে চলে গেলেন। বাইরে তাঁর গলা শোনা গেল। কাকে ডাকাডাকি করছেন।

গজপতি বললেন—ইলেকট্রিসিটি কেন নেই জানো? ভূতদের ওই আলো সয় না। লণ্ঠন, হ্যাসাগ অব্দি বড়জোর সয়। ওই ইলেকট্রিসিটির জ্বালায় তো ভূতবংশ লোপ পেতে বসেছে।

ভবভূতি দমে গেছেন এখন। সায় দিয়ে মাথাটা নাড়লেন শুধু। তারপর বারবার জানলার দিকে তাকাতে থাকলেন। বলা যায় না, কখন কী বিতিকিচ্ছিরি ভুতুড়ে চেহারা জানলায় উঁকি দিয়ে ওইরকম একখানা পিলে-চমকানো হাসি হাসবে হয়তো। মনে হচ্ছে, রাইফেলটা আনলে ভাল হত। কিন্তু রাইফেল কি এরা ছুড়তে দিত? তার চেয়ে বড় কথা রাইফেলের গুলি ভূতের গায়ে লাগত কি না তাই বা কে জানে। কখনও তো পরীক্ষার সুযোগ পাননি।...

কিছুক্ষণ পরে চা খেতে-খেতে ভবভূতি এই অভয়ারণ্যের ভূত-বৃত্তান্ত বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

গজপতির ভাগ্নে ডঃ ভূতনাথ পাত্র অমায়িক মানুষ। রোগা সিড়িঙে চেহারা। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। চুলগুলো ছোট এবং সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। গোঁফটাও তাই। এই শরতের ভ্যাপসা গরমেও স্যুট-টাই পরে আছেন। গজপতির চোখ নাচছে অনবরত। যেন বলতে চাইছেন, দেখছ তো—আমি কেমন ভাগ্নের মামা? ভাগ্নে পাক্কা সায়েব।

ডঃ ভূতনাথ বলেছিলেন—আপনি তো শিকারী মিঃ পতিতুণ্ডু।

আপনি ব্যাপাটা বুঝবেন ভাল। আপনার যেমন বন্যপ্রাণী—বিশেষ করে বাঘের ব্যাপারে তীব্র কৌতূহল ছিল বললেন—আমারও ছেলেবেলা থেকে ভূতের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহ ছিল। যাই হোক, হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলুম মেকসিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূততত্ত্বে গবেষণার জন্যে সেখানকার সরকার বৃত্তি দিচ্ছেন। অমনি কপাল ঠুকে দরখাস্ত করে দিলুম। ইণ্টারভিউয়ে ডাক পড়ল। পাস করে গেলুম। তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন। শুনেও থাকবেন।

সাগ্রহে ভবভূতি বললেন—শুনেছি। কিন্তু এই প্রকল্পে কীভাবে ভূত এনে জড়ো করেছ, সেই কথা বলো তো বাবা, শুনি।

ডঃ ভূতনাথ একটু হেসে বললেন—সে অনেক হাঙ্গামা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল—কেউ কোথাও ভূতের খোঁজ পেলে জানান পুরস্কৃত করা হবে। বিস্তর চিঠি এসেও ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ জায়গায় গিয়ে দেখি, মিথ্যে ভোগাচ্ছে। তবে কিছু জায়গায়—যেমন ধরুন, কলকাতার পুরনো কয়েকটা বাড়ির ছাদ, চিলেকোঠা, সিঁড়ি হাতড়ে তিন রকম প্রজাতির ভূত পেয়েছিলুম। এরা সবাই কিন্তু মানুষ ভূত। কেউ আত্মহত্যা করে ভূত হয়েছে। কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কেউ খুন হয়ে মরেছে।

গজপতি বললেন—ভালভাবে না বোঝালে ভবভূতি বুঝতে পারবে না।

—তাহলে শুনুন। ভূতজাতি মূলত তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত। মানুষভূত অর্থাৎ যাকে বলা হয় প্রেত। আর প্রকৃত ভূত—যারা মানুষ বা কোন জন্তুর অশরীরী আত্মা নয়। স্রেফ ভূত। তৃতীয় উপজাতি হচ্ছে প্রাণীজ ভূত অর্থাৎ মানুষ বাদে অন্যান্য প্রাণী মরে যে ভূতের জন্ম। যেমন ধরুন, গরু মরে যে ভূত হয়েছে, তার নাম 'গোদানো'।

ভবভূতি আরও কৌতূহলী হয়ে বললেন—সবরকম ভূতই তো এখানে রয়েছে?

ভূতনাথ বললেন—হুঁউ। তবে সবসময় দেখা পাওয়া মুশকিল।

আপনি তো সুন্দরবন অভয়ারণ্যে গেছেন। কবার বাঘ দেখতে পেয়েছেন, বলুন ?

ভবভূতি সায় দিয়ে বললেন—তা ঠিক। তবে ওরা একটা টাওয়ার বানিয়ে রেখেছে জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে গিয়ে···

বাধা দিয়ে ডঃ ভূতনাথ বললেন—এখানেও বানিয়েছি আমরা। নিয়ে যাব আপনাদের। তবে সাবধান, কথা বলবেন না কিন্তু। চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

ভবভূতি বললেন—আমি শিকারী। ও কি নতুন কথা আমার কাছে?

শুনুন গ্রামাঞ্চলে কীভাবে ভূত খুঁজে এনেছি। গ্রামে খবরের কাগজ ক'জন পড়ে? তাই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। তার ফলে অসংখ্য জায়গা থেকে নানারকম ভূতের খোঁজ পাওয়া গেল। যেমন ধরুন, বীরভূমের একটা দিঘির এক কোনায় শাঁকচুন্নীর খোঁজ পেলুম। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম।

—কিন্তু ওদের ধরে আনলে কীভাবে ?

ডঃ ভূতনাথ একটু হেসে বললেন—খুবই সোজা, খুবই সোজা। শুধু জানতে হয়, কোন প্রজাতির ভূতের কী খাদ্য। ব্যস! বীরভূমের সেই শাঁকচুন্নীর আড্ডায় একরাত্রি গিয়ে বসে রইলাম। ওর প্রধান খাদ্য মাছ। মাছ দেখে তক্ষুণি ওর নোলায় জল ঝরতে লাগল। ঘোমটার ফাঁকে বলল—এঁকটা মাঁছ দেঁ নাঁ ভাঁই। আমি অমনি উঠে চলতে শুরু করলুম। সারাপথ ও পেছনে চাইতে চাইতে আসে, আর আমি বলি—আর একটু গিয়ে দেব, চলে আয়! ব্যস! এই করে এখানে নিয়ে এলুম। এখানে পুকুর বানিয়ে অঢেল মাছ ছেড়েছি। শাঁকচুন্নীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা খাবার খাচ্ছে। বাকিটা আমরা কলকাতায় চালান দিচ্ছি।

এই শুনে গজপতি মন্তব্য করলেন—সেইসব মাছই তো কলকাতার বাজারে বিক্রি হচ্ছে। স্বাদেই বোঝা যায়। শাঁকচুন্নীরা শুঁকে ফেলে দেয়, তাই ওরকম। বুঝলে তো ?

ভবভূতি বললেন—আচ্ছা বাবা ভূতনাথ! দুধ, রসগোল্লা, পাকা কলা এসব সুখাদ্য কোন্ ভূত খায়?

—ভূত নয় ভূতিনী বলুন। এরা প্রেত উপজাতির অন্তর্গত। অর্থাৎ কোন পেটুক মেয়ে মরে ভূত হয়েছে।

যেই কথাটা বলা, অমনি জানলার বাইরে থেকে খ্যানখেনে গলায় কে বলে উঠল কী, কী কী বঁললি? শুঁধু মেয়েঁরাই ওঁসব খাঁয়?

ভবভূতি আঁতকে উঠে দেখলেন—নির্ঘাৎ ভূতিনীই বটে, চুলের যা ছিরি—তার পরনে শাড়ি, কতরকম গয়নাও পরা, জানালায় দাঁড়িয়ে চোখ কটকটিয়ে তাকিয়ে আছে।

ডঃ ভূতনাথ ধমক দিয়ে বললেন—পেঁচোর মা! এখন চলে যাও তো এখান থেকে! আমরা কথা বলছি, দেখছ না? কিছু বলার থাকলে পরে এসো। না হয়, দরখাস্ত কোরো।

ভূতিনী জিভ বের করে, কেন কে জানে ভবভূতির দিকেই ভেংচি কেটে সরে গেল। গজপতি খিকখিক করে হেসে বললেন—পেঁচোর মা সেবার আমাকে বাগবাজারের রসগোল্লা আনতে বলেছিল। ভুলে গেছে নিজেই।

—পেঁচোর মা! মানে? ভবভূতি জিজ্ঞেস করলেন।

জবাবটা দিলেন ডঃ ভূতনাথ।—ওর ছেলে পেঁচোও যে ভূত। তার মানে, প্রেত। ট্রেনে চাপা পড়ে মারা গেছে।

ভবভূতি বললেন—আচ্ছা বাবা ভূতনাথ, এত যে ভূত রেখেছ অভয়ারণ্যে, তুমি কিংবা তোমার কর্মচারীরা কেউ কখনও বিপদে পড়োনি তো?

ডঃ ভূতনাথ বললেন—নাঃ। বুঝতে পারছেন না? বেছে বেছে কর্মচারী রাখা হয়েছে। রীতিমতো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ভূত নিয়ে কাজ করা তো সহজ নয়!

এই সময় ভবভূতির মনে হল তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে কী যেন ঢুকেছে। ঘুরেই আঁতকে উঠলেন। চেয়ারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে একটা বছর নয়-দশ বয়সের ছেলে—কিন্তু সত্যি কি ছেলে?

—তাঁর পকেটে একটা কালো কুচকুচে লিকলিকে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে। ভবভূতি কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কে, কে ?

ডঃ ভূতনাথ ধমক দিলেন—অ্যাই পেঁচো ! কী হচ্ছে ?

শ্রীমান পেঁচো বলল—চঁকোলেঁট খুঁজছি ভুঁতুমঁামা !

—হাত বের কর বলছি ! বের করে নে হাত ! ডঃ ভূতনাথ উঠে দাঁড়ালেন। ছিঃ ! ওই নোংরা হাত তুই কোন্ আক্কেলে পকেটে ঢোকালি ? মুখে চাইলেই পারতিস !

পেঁচো হিঁ হিঁ করে হেসে হাত বের করে নিল। তারপর চেয়ারের পেছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভবভূতির গলায় দুহাত আঁকড়ে আব্দেরে গলায় বলল—এঁকটা চঁকোলেঁট দাঁও নঁা দাঁদু ! সেই সঙ্গে বেজায় রকম কাতুকুতুও দিতে থাকল।

কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাত ! ভবভূতির দম আটকে যাচ্ছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গোঁ গোঁ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ভূতোর মতোই হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁক্ হিঁক্ করে হেসে উঠলেন।

ভবভূতি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বসলেন। দেখলেন নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। ঘরে সকালের রোদ ঢুকেছে। তাঁর নাতি রুনু বলল—ও দাদু, এখনও ঘুমোচ্ছ তুমি ? আমি কখন উঠেছি।

ভবভূতি আগে ভালভাবে দেখে নিলেন রুনু, না পেঁচো। তারপর শুধু বললেন—হুঁ।

—ও দাদু, একটা চকোলেট দাও না।

ভবভূতি চমকে উঠলেন। এও যে চকোলেট চায় !

কিন্তু নাঃ, মনের ভুল। স্বপ্নই দেখছিলেন বটে। কাল সন্ধ্যায় গজপতির সঙ্গে ভূত নিয়ে বেজায় তর্ক হয়েছিল, মনে পড়ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ডাকিনীতলার বুড়ো যখ

আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বাগান, তারপর ধূ-ধূ মাঠ। মাঠের মধ্যিখানে ছিল একটা বটগাছ। গাঁয়ের লোক বলত ডাকিনীতলা।

ডাকিনীতলা, তার মানে ওই ধূ-ধূ তেপান্তরের একলা দাঁড়ানো বটগাছটার দিকে দুপুরবেলা তাকিয়ে থাকতুম যদি ডাকিনীটাকে দেখতে পাওয়া যায়। রোদ্দুর চনমন করত মাঠে। জন নেই মানুষ নেই। খাঁ খাঁ চারদিক। কথায় বলে, 'ঠিকঠাক দুক্কুর বেলা, ভূতপেরেতে মারে ঢেলা।' দুপুরবেলায় ভূতপ্রেত-ডাকিনীরা পাড়া-গায়ের গাছগুলিতে ওঁৎ পেতে থাকে কিনা। একলা দোকলা গাছতলায় যেই গেছ, টুপটাপ ঢিল পড়বে গায়ে। ঢিলও দেখতে পাবে না তুমি, কে ঢিল ছুড়ল তাকেও দেখবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

অতদূর থেকে একটা ছোট্ট ছেলেকে ডাকিনীতলার গেছো ডাকিনী ঢিল ছুড়ে মারবে, সেই গায়ের জোর ডাকিনীটার নিশ্চয় ছিল না। বটতলায় গেলে তো!

কিন্তু ওরা নাকি সবই দেখতে পায়। যতদূরেই থাকো, চোখে পড়বেই। একদিন হয়েছে কী, দুপুরবেলা রোজ যেমন বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে দূরে ডাকিনীতলার দিকে তাকিয়ে থাকি—সেই রকম তাকিয়ে আছি, হঠাৎ চোখ পড়ল হাজরা-মশায়ের ছেলে নীলু হাফপেন্টুল পরে খালি গায়ে মাঠের দিকে চলছে। নীলু আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। ক্লাসের সবচেয়ে ভীতু ছেলে—আবার তেমনি বেহদ্দ গোবেচারা। তাই তাকে অমন হনহন করে ডাকিনী-তলার দিকে যেতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলুম। এই রে! নির্ঘাৎ

ও মরবে। যেই যাবে কাছাকাছি, ডাকিনীটা ওর গলা মটকে রক্ত চুষে খাবে।

হাঁ করে তাকিয়ে ওর কাণ্ড দেখছি, এমন সময় আমাদের কুকুর ভুলো এসে আমার পা শুঁকে লেজ নেড়ে কেঁউ কেঁউ করে উঠল। ভুলোর মতো তেজী কুকুর গাঁয়ে আর দুটো নেই। ওর গায়ের গন্ধ পেলেই মাঠের শেয়ালগুলো লেজ গুটিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালায়। একবার এক ভালুকওলা এসেছে ভালুকের নাচ দেখাতে। ভুলো সেই নাচুনে ভালুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলে আর কী! অনেক কষ্টে ছাড়ানো হয়েছিল তাকে। অথচ কুকুর ভালুক দেখলে কী যে ভয় পায়, সবাই জানে।

ভুলোকে দেখে আমার সাহস বেড়ে গেল। ওর গলায় হাত বুলিয়ে বললুম—এই ভুলো! আমার সঙ্গে যাবি?

ভুলো লেজ নেড়ে সায় দিয়ে বলল—হুঁউ।

ভালুক যদি জব্দ হয়, ভুলোর পাল্লায় পড়ে ডাকিনীও নিশ্চয় জব্দ হবে। অতএব তখুনি মাঠের দিকে চলতে থাকলুম। ভুলো আমার সঙ্গে চলল, কখনও পিছনে, কখনও এপাশে ওপাশে সে ছুটোছুটি করে এগোচ্ছিল। এদিকে সারাক্ষণ আমার চোখ রয়েছে, নীলুর দিকে। একটু পরেই দেখলুম, নীলু বটতলায় পৌঁছে গেল। কিন্তু তারপর ছায়ার আড়ালে তাকে এতদূর থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। আমার মাথায় তখন অনেক ভাবনা জেগেছে। এভাবে নীলু ওখানে গেল কেন? ডাকিনীটা কি গাঁয়ে এসে ওকে ভুলিয়েভালিয়ে নিজের ডেরায় মারতে নিয়ে গেল? সর্বনাশ! তাহলে তো ওকে বাঁচাতেই হবে।

ভুলো যখন সঙ্গে আছে তখন আমার ভয় নেই। আমি জোরে হাঁটতে থাকলুম। নির্ঘাৎ বোকা নীলু ডাকিনীর পাল্লায় পড়ে গেছে।

বটতলার কাছাকাছি যেতে না যেতে ভুলো লেজ তুলে আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে হঠাৎ লম্বা একটানা 'ঘেউ-উ' ঝাড়ল।

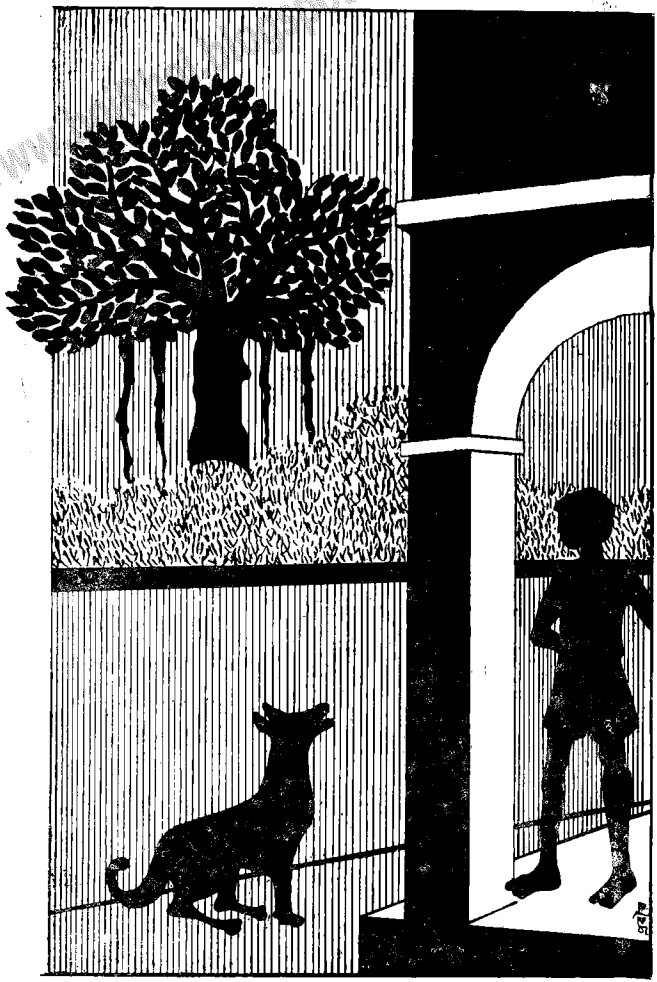

ভুলো মুখের দিকে তাকিয়ে কুকুরের ভাষায় বলল··· (পৃঃ ২৪)

এইতে আমার বুক একটু কেঁপে উঠল। মামার কাছে শুনেছি, জীবজন্তুরা ভূতপ্রেত ডাকিনী সবাইকে দেখতে পায়। তার মানে, আমরা যাদের দেখি না, ওরা তাদের দিব্যি দেখতে পায়। এমনকি দেখেছি, পাঁচিলের ওপাশে অচেনা মানুষ এলে ভুলো তাও টের পায় এবং বেজায় হাঁকডাক শুরু করে। রাতের আঁধারেও তো ভুলো দেখতে পায়—অথচ আমাদের আলো চাই-ই।

কাজেই ভুলো নিশ্চয় একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে-ভয়ে বললুম—ভুলো! কিছু দেখতে পাচ্ছিস নাকি?

ভুলো আমার দিকে ঘুরে লেজ নেড়ে কুকুরের ভাষায় বলল—হুঁউ। তারপর সে আচমকা বটতলার দিকে দৌড়াতে থাকল। দেখা দেখি, আমিও সঙ্গে নিলুম। তারপর বটতলার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলুম—নীলু! নীলু!

বটতলায় কখনও এর আগে যাইনি। কী প্রকাণ্ড গাছ! চারপাশে অনেক ঝুরি নেমেছে। গুঁড়িটাও পেল্লায় মোটা। শেকড় বাকড়ে ছড়ানো রয়েছে অগুনতি। শনশন করে বাতাস বইছে। বটের পাতা কাঁপছে। ভুলো মাটি শুঁকে ঘুরঘুর করছিল। নীলুর কোন সাড়া পেলুম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল বাতাসের সুরে কে যেন গান গেয়ে কিছু বলছে। গা শিউরে উঠল। আবার ডাকলুম—নীলু! নীলু! কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না।

এই সময় ভুলো মুখ তুলে আবার একখানা লম্বা 'ঘেউ-উ' ঝাড়ল। তারপর দৌড়ে গাছের ওপাশে চলে গেল। তখন আমিও গেলুম।

গিয়ে যা দেখলুম, থ বনে দাঁড়াতে হল। এক বুড়ো বসে রয়েছে। তার পাশেই একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটলি। একটা লাঠি। তার সামনে মাটিতে বসে আছে নীলু। বুড়ো লোকটা চোখ বুজে যেন ধ্যান করছে। তার গায়ে একটা তালিমারা ফতুয়া—খুব নোংরা সেটা। মাথায় একটা পাগড়ি। তার কানে বড় বড় তামার আংটি ঝুলছে। গলায় একটা মস্তো চাঁদির চৌকো চাকতি আছে।

এইবার মনে পড়ে গেল—আরে! এ তো সেই ম্যাজিসিয়ান! সেদিন আমাদের পাড়ায় ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। আমি আরও অবাক হয়ে গেলুম।

নীলু এতক্ষণ আমাকে দেখেও যেন দেখছিল না। আবার চোখে চোখ পড়তেই সে ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ করতে ইশারা করল। তারপর চোখ নাচিয়ে তেমনি ইশারায় ম্যাজিসিয়ানকে দেখিয়ে তার পাশে বসতে বলল।

নীলুর পাশে গিয়ে বসে পড়লাম। ভুলো এসে আমার পাশে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে আবার কোথায় চলে গেল।

একটু পরে বুড়ো ম্যাজিসিয়ান চোখ খুলল। বিড়বিড় করে কী অস্পষ্ট মন্ত্র পড়ল যেন। তারপর একটু ঝুঁকে নীলু ও আমার ওপর তিনবার ফুঁ দিল। ভয়ে বুক কাঁপল। এমন কেন করল ও?

তারপর লোকটা একটু হেসে মিঠে গলায় বলল—এ ছেলেটি কে বাবা?

নীলু বলল—আমাদের পাড়ায় থাকে। বিজু, তোর নাম বল্।

ম্যাজিসিয়ান হাত তুলে বলল—থাক্ থাক্। বিজু তো? ব্যস, ওতেই হবে।

নীলু বলল—বিজু, তোকে কিন্তু দুটো টাকা দিতে হবে। আমিও দিয়েছি।

বললুম—দেব। কিন্তু এখন যে নেই রে!

ম্যাজিসিয়ান বলল—আচ্ছা, আচ্ছা এবার শোন বাবা, আমি যা করার সব করে দিয়েছি। এখন তোমাদের কি করতে হবে, বলছি। আমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে এই গাছ থেকে একটা লাল টুকটুকে ফল পড়বে। সেই ফলটি দুজনে ভাগ করে খাবে। খেলেই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তখন দেখবে, আমার মতো একজন বুড়ো মানুষ এই গাছের গোড়ার মাটি ঠেলে বেরোচ্ছে। তাকে তোমরা দু'জনে টেনে তুলবে। এতে সে খুশি হবে তোমাদের ওপর। তখন বলবে—কী চাই? তোমরা বলবে—তুমি যদি যখ

হও, তাহলে তোমার টাকাগুলো দাও। অনেক টাকা, বাবা! শুধু টাকা নয়—কত সোনাদানা পেয়ে যাবে।

নীলু ঘাড় নাড়ল। ম্যাজিসিয়ান বলল—তাহলে আমি চলি। কেমন?

নীলুর দেখাদেখি আমিও ঘাড় নাড়লুম। সে পুঁটলিটা কাঁধে নিয়ে ছড়ি হাতে উঠল। তারপর আচমকা হনহন করে প্রায় দৌড়তে শুরু করল।

এইতে ভুলো কেন যে খেপে গেল কে জানে, দেখলুম—ভুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছন-পেছন দৌড়চ্ছে। আমার ভয় হল, ম্যাজিসিয়ান রেগে যায় যদি! ভুলোকে সে নির্ঘাৎ মন্ত্রের জোরে মেরে ফেলবে। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে থাকলুম—ভুলো! ভুলো! ফিরে আয়!

আমার ডাক শুনে ভুলো থমকে দাঁড়াল। আর এগোল না। কিন্তু ফিরেও এল না। ওখানে দাঁড়িয়ে ম্যাজিসিয়ানের উদ্দেশে রাগ দেখাতে থাকল।

নীলু চোখ নাচিয়ে বলল—তুই কী করে জানলি রে?

বললুম—তোকে আসতে দেখলুম যে। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানকে কোথায় পেলি?

নীলু বলল—আজ সকাল বেলা রাস্তায় দেখা হয়েছিল। ও বলল—দুটো টাকা দিলে যখের ধন পাইয়ে দেবে। ঠাকমার ঝাঁপি থেকে মেরে দিলুম দুটো টাকা! ওকে দিলুম। ও বলল—ঠিক দুপুরবেলা ডাকিনীতলায় চলে এসো। এবার বুঝলি তো?

বুঝলাম—কিন্তু আমি যে ওকে টাকা দিইনি। যখের ধনের ভাগ আমি পাবো তো নীলু?

নীলু গম্ভীর হয়ে একটু ভেবে বলল···যখবুড়োকে জিগ্যেস করব। যদি বলে, তুইও পাবি—তাহলে পাবি। জানিস তো, যখের ধন সবাইকে সয় না। যাক্ গে—আর কথাটথা নয়। চুপচাপ বসে পড়ি আয়। ফলটা কখন পড়বে কে জানে!

আমরা আর কথা না বলে গাছের গুঁড়ির কাছে চুপচাপ বসে পড়লুম।...

দুজনে বসে আছি তো আছি—ফল পড়ার নাম নেই। ভুলো আপন মনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কখনও গাছের দিকে তাকিয়ে লেজ নেড়ে যেন ডাকিনীটাকেই ধমক দিচ্ছে।

কিন্তু ফল পড়ছে কোথায়? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তখনও ফল পড়ল না। বটগাছে রাজ্যের পাখি এসে ততক্ষণে জড়ো হয়েছে। তারা জোর চেঁচামেচি শুরু করেছে। ভুলো এইতে আরো ক্ষেপে গেছে। গাছের চারদিক ঘুরে সে ঘেউ ঘেউ করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার চোখ গেল গাছের গুঁড়ির ওপরে একটা মোটা ডালের দিকে।

যা দেখলুম, আমার মাথার চুল ভয়ে খাড়া হয়ে গেল। ওরে বাবা! ও কে? নিশ্চয় ডাকিনীতলার সেই বুড়ো যখটা চুপচাপ বসে আছে। পিটপিট করে আমাদের দেখছে। চেঁচিয়ে উঠলুম—নীলুরে!

নীলুও দেখতে পেয়েছিল। তার মুখে কথা নেই।

ভুলো কিন্তু ভয় পায়নি। সে এবার বিরাট গর্জন করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওঠার ভঙ্গিতে লম্ফঝম্ফ শুরু করল। নখের আঁচড়ে গুঁড়িতে দাগ পড়তে থাকল। শাদা আঠা দুধের মতো বেরিয়ে এল। তারপরই ওপর থেকে আওয়াজ হল—'উঁ-উঁ-প্'!

অমনি আমি দৌড়তে থাকলুম। সোজা নাক বরাবর দৌড়লুম। কতবার আছাড় খেলুম, কত জায়গায় ছিঁড়ে গেল। তারপর দেখলুম, ভুলোও আমার সঙ্গে চলে এসেছে। পেছন থেকে নীলুর চেঁচানি বুঝলুম—বিজু! বিজু! পালাসনে।

ঘুর দেখি, সে দৌড়ে আসছে। তখন সাহস করে দাঁড়ালুম। কাছে এসে নীলু বলল—তুই বড্ড ভীতু! ওটা হনুমান।

—অ্যাঁ? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলুম ওর দিকে।

www.boiRboi.blogspot.com

নীলু বলল —ধুর বোকা! হনুমান দেখিসনি কখনও? হনুমান দেখেই ভয় পেয়ে গেলি?

তখন মনে পড়ল, হ্যাঁ—হনুমানই উঁ-উঁপ্ করে ডাকে বটে। কিন্তু অমন জায়গায় হনুমানকে কি হনুমান বলে মনে হয় কখনও? মনে তখন কিনা সেই বুড়ো যখটার ভাবনা। কাজেই হনুমান দেখেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

তবে বলা যায় না, বুড়ো যখটা হনুমানের চেহারা নিয়ে আমাদের দেখা দিতেও তো পারে? কথাটা নীলুকে বললে সে তখুনি মেনে নিল। তাও পারে বই কি। ফেরার পথে কানে এল, ডাকিনীতলায় সেই যখ কিংবা হনুমান ব্যাটা যেন আমাদের অমন করে চলে আসায় বেজায় রেগে গেছে। উঁ-উঁপ্ খ্যাঁকোর খ্যাঁক্! উঁপ্ খ্যাঁকোর খ্যাঁক্! খুব হাঁকডাক চালিয়ে যাচ্ছে।

নীলু বলল—চল্ সন্ধে অব্দি বসে থেকে দেখি ফল পড়ে নাকি।

বললুম—পাগল! তুই যাবি তো যা।

—যখের ধনের ভাগ নিবিনে?

—নাঃ! বলে ভুলোকে শিস দিয়ে ডাকলুম।

www.boiRboi.blogspot.com

আসল ভূতের গল্প

ভূতের গল্পও তো অনেকেই শুনেছ। কিন্তু দেখেছে ক'জন? যারা দেখেছে বলে, তারা কিন্তু নকল ভূতই দেখেছে। আসল ভূত কি দেখা দেয়?

বলবে, ভূতের আবার আসল নকল আছে নাকি? আলবৎ আছে। যেমন ধরো, দুপুর রাতে পাঁচিলের ধারে হঠাৎ দেখলে ঘোমটা পরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকলে। তখন বাবা গিয়ে দেখলেন, খেন্তিপিসি দিনে কাপড় শুকোতে দিয়েছিলেন তারে। তোলা হয়নি। বাতাস বইছিল জোরে। কাপড়টা উড়ে গিয়ে জবাগাছের মাথায় জড়িয়ে গেছে। আর তাই দেখে হঠাৎ ভূত ভেবে বসে আছো।

এই হল নকল ভূত। নকল ভূত আমিও কি কম দেখেছি? কিন্তু সে-গল্প শুনেও লাভ নেই। আমার বোকামি ধরা পড়বে। তোমরাও হেসে খুন হবে। নিজের বোকামির কথা কি কেউ বলতে চায়?

আমি একবার একটা আসল ভূত দেখেছিলাম। একেবারে নির্ভেজাল আদি অকৃত্রিম ভূত। সেই ভূতের গায়ে অনায়াসে "বিশুদ্ধ এবং টাটকা" বলে লেবেল এঁটে দেওয়া যায়।

কিন্তু এখন যেমন সহজে বলে যাচ্ছি, আসল ভূতটা দেখার সময়ে মোটেও ব্যাপারটা সহজ ঠেকেনি। ওরে বাবা! সে বড় গোলমেলে ব্যাপার। আর সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তখন আমার বয়স মোটে বারো বছর। পড়ি ক্লাস এইটে। আমাদের স্কুলটা ছিলো দুটো গাঁয়ের মধ্যিখানের মাঠে একেবারে নিরিবিলি জায়গায়। চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়

ছিল। পিছনের পুকুরপাড়ে কল্কে ফুলের জঙ্গল ছিল। তার মাঝখানে ছিল মুক্তকেশীর মন্দির। ভাঙাচোরা কতকালের পুরনো মন্দির। সাপের ভয়ে ওদিকটায় ছেলেরা খুবই কমই যেত।

আমার এক সহপাঠী ছিল, তার নাম পোদো। কাল কুচকুচে চেহারা। বলিষ্ঠ গড়ন। খেলাধুলোয় খুব ঝোঁক ছিল ওর। কিন্তু পড়াশুনায় তেমন কিছু নয়। কোনরকমে টেনেটুনে পাস করে যেত।

আমার সঙ্গে পোদোর ভাব হবার কারণ, ক্লাসে মাস্টারমশাই পড়া জিজ্ঞেস করলে আমি ওকে ফিসফিস করে বলে দিতুম। পরীক্ষার সময় তো কথাই নেই। আমার খাতা থেকে টুকতে দিতুম। এতে আমারও লাভ ছিল। কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হলে পোদো আমার পক্ষ নিত।

তখন পাড়াগাঁয়ে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রব ছিল। মহামারীর মতো গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছিল এই রোগে। বার্ষিক পরীক্ষার কয়েকদিন আগে বেচারা পোদো ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা গেল। আমি একেবারে একা হয়ে গেলুম যেন। মন ভেঙে গেল। পড়াশুনো যা করেছিলুম সব ভুলে গেলাম যেন।

ইংরেজি আর বাংলা পরীক্ষা তো কোনরকমে দিলুম। তৃতীয় দিনে ভূগোল আর সংস্কৃত। ভূগোলও মোটামুটি হল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রশ্ন দেখে চড়কগাছ। একে তো পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসে বরাবর ফাঁকি দিয়েছি, তার ওপর এই দেবভাষার ব্যাকরণ ব্যাপারটা আমার কাছে প্রচণ্ড হেঁয়ালি ঠেকেছে বরাবর। তখন শীতের বিকেল নেমেছে। স্কুলের পেছনের গাছপালায় ঘন ছায়ায় ঘরের ভেতরটা আবছা হয়ে এসেছে। তখন তো গাঁয়ে বিদ্যুৎ ছিল না।

আমি জানলার পাশের সিটে বসেছিলুম। প্রশ্নপত্র নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি। হঠাৎ চোখের কোনা দিয়ে দেখলুম, হ্যাঁ—সেই পোদোই বটে, পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে ময়লা একটা শার্ট, জানলার বাইরে ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করছে।

হঠাৎ চোখের কোনা দিয়ে দেখলুম....হ্যাঁ, সেই...(পৃঃ-৩০)

প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম আর কী! ভয়ে নয়—আনন্দে। কিন্তু তক্ষুনি মনে-পড়ে গেল, পোদো তো মারা গেছে। আর অমনি সারা শরীর হিম হয়ে গেল। ভয়ে চোখ বুজে ফেললুম।

সংস্কৃতের পরীক্ষা। পণ্ডিতমশাই নিজেই গার্ড দিচ্ছিলেন ঘরে। বললেন—ও কী রে তপু। ধ্যান করছিস নাকি? অ্যাঁ?

চোখ খুলে কাঁচুমাচু মুখে বললুম—পো-পো-পোদো স্যার।

—পোদো? পোদোর জন্যে শোকপ্রকাশ করছিস? অ্যাঁ? এই বলে পণ্ডিতমশাই আকর্ণ হাসতে লাগলেন। ঘরসুদ্ধ ছেলেরাও আমার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি শুরু করল।

পণ্ডিতমশাই তারপর হাসি থামিয়ে গর্জে বললেন—বন্ধুর জন্যে শোকপ্রকাশ পরে হবে। বুঝেছ?

পণ্ডিতমপাই কিন্তু ভীষণ রাগী মানুষ। দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতেন। নয়তো কান ধরে মার্চ করাতেন। এমনি সব শাস্তি দিতেন আমাদের। তাই আর ওঁকে কিছু বলার সাহস হল না। লেখার ভান করলুম।

কিন্তু মনে অস্বস্তি। আবার একটু পরে চোখের কোনা দিয়ে জানালার বাইরে তাকালুম। কী আশ্চর্য! পোদোই তো! ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এবং চোখ টিপে আমাকে ইশারা করছে। এবার স্পষ্ট দেখলুম, তার হাতে একটা কাগজ। কাগজের দিকে ইশারা করে সে কিছু বলতে চাইছে যেন।

কাঁপতে কাঁপতে বললুম—পো-পো-পোদো স্যা-স্যার!

পণ্ডিতমশাই এবার সোজা আমার কাছে এসে বাজপড়ার মতো আওয়াজ দিলেন—রসিকতা হচ্ছে? রসিকতা? পাষণ্ড! অনঢান! বলীবর্দ!

তখন গলা শুকিয়ে গেছে। বোবায় ধরেছে যেন। অতিকষ্টে বললুম—জ-জল স্যার!

ক্লাসে ছাত্রদের জল খাওয়ানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাইরে টিউবেলে গিয়ে খেয়ে আসতে হত। টিউবেলটা ছিল খেলার মাঠের

এককোনায়। পণ্ডিতমশাই দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—জল খাবে তো পোদো-পোদো করছ কেন মূর্খ? যাও—গিয়ে জল খেয়ে এস।

বাইরে গেলুম। কোথাও কেউ নেই। পরীক্ষার সময় আজকালকার মতো গার্জেনরা তখন স্কুলের আনাচে-কানাচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন না।

ভয়ে-ভয়ে টিউবেলের কাছে গিয়ে সেই ঝোপটার দিকে তাকালুম। নাঃ। কেউ নেই তো ওখানে! একহাতে টিউবেলের হাতল চেপে অন্যহাতে জল খাওয়া ভারি কঠিন। হঠাৎ মনে হল হাতলটায় কেউ চাপ দিচ্ছে। গলগল করে জল পড়তেও দেখলুম। জলের তেষ্টা এত বেশি যে অত কিছু লক্ষ্য না করে জল খেতে থাকলুম।

জল খাওয়ার পর ভয়টা অনেকটা কেটে গেল। তখন মনে হল, নেহাত চোখের ভুল। সেই সময় চোখ গেল মুক্তকেশীর মন্দিরের দিকে। অমনি আবার বুক কেঁপে উঠল। কী অবাক। পোদো মন্দিরের বারান্দা থেকে হাত ইশারা করে ডাকছে।

মনে হল, তাহলে নিশ্চয় পেদো একেবারে মারা পড়েনি। তার মানে, শ্মশানে গিয়ে যেভাবেই হোক বেঁচে উঠেছিল—কিংবা কোন সাধু সন্ন্যাসীর দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। আমাদের খবরটা কোন কারণে জানানো হয়নি।

ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে এভাবেই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলুম। মরিয়া হয়ে মন্দিরের জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম।

সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বললুম—পোদো! তুই বেঁচে আছিস?

পোদো ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় চুপ করতে বলল। তারপর বারান্দার ওপর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ ফেলে দিল। কাগজটা খুলে দেখি, সংস্কৃতের প্রশ্নের কতকগুলো উত্তর লেখা রয়েছে। ঠিক এগুলোই আমার জানা ছিল না।

কাগজে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা উত্তরগুলো প্রাণপণে মুখস্থ করতে থাকলুম। পোদোর বাঁচা-মরা ব্যাপারটা তখন মাথায় আর নেই, পরীক্ষা বলে কথা।

একটু পরেই আচমকা কে আমার কান ধরে ফেলল। অমনি আঁতকে উঠে দেখি পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিতমশাই চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে হতচ্ছাড়া তস্কর। ওরে কূটবুদ্ধি কুষ্মাণ্ড! পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে এখন এমনি করে চুরির রাস্তা ধরেছ?

কাঁদোকাঁদো স্বরে বললুম—না স্যা-স্যর। পো-পো-পো···

—চোপরাও! স্তব্ধ হও তস্কর বালক! পণ্ডিতমশাই আমাকে সেই কাগজটা শুদ্ধু হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন।···

ক্লাস এইটে ফেল করেছিলুম সেবার—সে ওই পোদোর ভূতের জন্যেই। কিন্তু কেউ কি সেকথা বিশ্বাস করল? বাবা বলেছিলেন—পড়াশুনা করবে না। তাই টুকলিফাই ছাড়া উপায় ছিল না। ধরা পড়ে বেচারা পোদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে!

কিন্তু কাকে বোঝাব, ব্যাপারটা কত সত্যি। আমি বলেছিলুম—কিন্তু হাতের লেখাটা তো আমার নয়! পোদোর লেখা ওটা। মিলিয়ে দেখ না।

শুনে দাদা বলেছিলেন—হতভাগা! অসুখের আগে পোদো তোর কাছে সংস্কৃতের মানে বইটা নিয়ে গিয়েছিল না? আমি দেখেছি, বইটা ফেরত আনার পর ওটার মধ্যে পোদোর হাতে লেখা একটা কাগজ ছিল। চালাকি করিস নে!

আমি কিন্তু দেখিইনি কোন কাগজ। যাক্ গে, যা হবার হয়েছে। এই গল্পটা অ্যাদ্দিন কাকেও বলিনি। বললেই তো বলবে, টুকলিফাই করে ভূতের ঘাড়ে বদনাম দেওয়া হচ্ছে। মহা ধড়িবাজ ছেলেরে বাবা!

www.boiRboi.blogspot.com

দুক্কুর বেলায় বটের তলায়

তখন ঠিকঠাক দুক্কুরবেলা। আকাশে কোন বদমেজাজী দেবতা যেন আজব ঝুড়িটি দিয়েছে উপুড় করে। আর সোনালী রোদ্দুর গড়িয়ে পড়েছে মাঠ-ঘাট জুড়ে। কী গরম, কী গরম! বুড়ো বটগাছটার মাথা গেছে গরম হয়ে। আপন মনে গজগজ করছে। আর তাই শুনে সাতভাই পাখপাখালি শুকনো পাতার ওপর গড়াগড়ি দিয়ে হেসে খুন। একশো ঝিঁঝিপোকা হাসতে গিয়ে শেষটা দেখি কেঁদেই ফেলল। ওই শোন, টানা সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে কখন থেকে।...

আরে। ওটা কে? মিলু নাকি? এস, এস। তোমার হাতে ওটা কী? গুলতি? কী মারবে? ব্যাঙ না পাখি? কাঠবেড়ালি, না ভোঁদড়? পোকা, না মাকড়?

ওসব নয়? তাহলে কী মারবে? ওরে বাবা! বাঘ! তা বাঘ এখানে কোথায়? বাঘ তো সোঁদরবনে। তবে যদি সিংহ মারতে চাও, কথা শোন। সোজা চলে যাও রায়বাবুদের পুকুরপাড়ে। ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন মা দুগ্‌গা, তাঁর পায়ের তলায় একটা সিংহ পেতেও পারো।

কী বলছ? ওটা খড়ের সিংহ? একটু দাঁড়িয়ে থেকে দেখই না, কী হয়। খড়ের সিংহ খাঁটি সিংহ হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। ঢাক বাজবে। কাঁসি বাজবে। মা দুগ্‌গার সিংহটা তখন দাঁত খিঁচিয়ে অসুরের কাঁধ ধরবে কামড়ে।

হুঁ, তোমার অত সময় নেই। তর সইছে না। তাই না? বেশ বেশ। শোন তাহলে। বরং একটা কুকুর মেরেই হাত পাকিয়ে নাও। ওই দেখ, সানুদের খেঁকি কুকুর ঘাস শুঁকতে শুঁকতে এদিকেই আসছে। গুলতি বাগিয়েই ধরো দিকি।

ওকি! ঘেউ শুনেই ভয় পেয়ে গেলে দেখছি! রামোঃ! তুমি দেখছি ভীতুর ভীতু। আরে, পালাচ্ছ কেন? ও মিলু!...যা বাবা! সত্যি ছেলেটা ভোঁ দৌড় দিল যে!

—তুমি আবার কে? বিলু? তুমিই বুঝি মিলুর বোন? বেশ, বেশ। তোমার হাতে ওটা কি? বই? বাঃ! বই পড়তে খুব ভালো লাগে তোমার? বইয়ে কিসের গল্প আছে? ভূতপেরেত রাক্ষস-খোক্কস দত্যিদানার তো। ছ্যা ছ্যা! ওসব তো নিছক গল্প। সত্যিকার ভূতপেরেত রাক্ষস-খোক্কস দত্যিদানা দেখতে চাও? ভয় কিসের?

—আরে, পালাচ্ছ কেন? ও বিলু! যা-বাবা। এও যে পালিয়ে গেল।

হুঁ, আবার একজন আসছে।...কে তুমি? আরে, তোমার চোখ দুটো দেখছি বেজায় লাল। ফুলো-ফুলো গাল। জল ছপছপ করছে। কাঁদছ কেন সোনা? মা বকেছে? এস, এস। ছায়ায় বসো টুকুন সোনা। এই দেখ, টুকটুকে লাল ফল ফেলে দিচ্ছি। এর নাম বটফল। এই নিয়ে খেলা করো। কেমন? একটু পরে দেখবে রাজ্যের পাখপাখালি বটফল খেতে এসে তুমুল ঝগড়া করছে। শেয়াল মামাও এসে যাবে ওবেলা। তখন মনে হবে সে এক আজব বাজার বসেছে। আমার পাতার ফাঁকে কত লাল টুকটুকে ফল ধরেছে দেখছ? নাও, যত ইচ্ছে নাও। খেলা করো ...

এখন ঠিকঠাক দুক্কুরবেলা। ওই দেখ, বুড়ো বটের ছায়ায় বসে কাদের বাড়ির খুকুমণি চোখ মুছতে মুছতে দু'হাত ভরে রাঙা টুকটুকে বটফল কুড়োচ্ছে।...

www.boiRboi.blogspot.com

করিম জোলার গল্প

আগের দিনে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ছিল বড় সরল। তাদের মধ্যে করিম জোলা ছিল আরও সরল। তাকে ঠকানো ছিল খুব সোজা। তার বোকামি নিয়ে কত গল্প চালু ছিল এক সময়।

আসলে করিম জোলার বোকামি নয়, বেশি রকমের সরলতারই পরিচয় মেলে ওইসব গল্পে। করিম সবাইকে বিশ্বাস করত। টের পেত না, ওকে বেকায়দায় ফেলে তামাসা করা হচ্ছে।

একবার করিম জোলা চলেছে অন্য গাঁয়ে কাপড় বেচতে। হঠাৎ সামনে পড়ল উলুকাশের বন। কাশফুল ফুটে সারা মাঠ সাদা হয়ে আছে। সে মুশকিলে পড়ল। এমন জিনিস তো কখনও দেখেনি!

এক চাষীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল—ভাই, ওটা কী?

দুষ্টুমি করে চাষী বলল—সমুদ্দুর! সাঁতার কেটে পার হও।

তাই শুনে করিম উলুকাশের বনে ঝাঁপ দিল এবং সাঁতার কাটতে শুরু করল। গা কেটে রক্তারক্তি।

বুঝতেই পারছ, চাষীকে বিশ্বাস করেই বেচারা সরল লোকটার দুর্দশা।

আরেকবার হয়েছে কী, করিম জোলা গেছে ঘোড়া কিনতে শহরে। একখানে কুমড়োওলা কুমড়ো বিক্রি করছে। করিম বলল—ভাই, এগুলো কী? লোকটা ভাবল, কী বুদ্ধুরে বাবা! কুমড়োও চেনে না। তাই তামাসা করে বলল—এগুলো হচ্ছে ঘোড়ার ডিম।

করিম জোলা লাফিয়ে উঠল। জ্যান্ত ঘোড়া কেনার চেয়ে ঘোড়ার ডিম কিনলে সস্তায় হবে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে। তাকে পুষে

বড় করবে। কী মজাই না হবে। সে খুশি হয়ে বলল—ভাই, দাম কত ?

চতুর কুমড়োওলা বলল—পাঁচ টাকা।

করিম ভাবল, বেশ শস্তাই বটে। ঘোড়ার দাম অনেক বেশি। সে তক্ষুণি টাকা দিয়ে কুমড়োটা মাথায় করে গাঁয়ের পথ ধরল।

মাঠের এইখানে উঁচু আলে হঠাৎ পা ফস্কে গেল তার। অমনি কুমড়োটা গেল পড়ে। পড়েই ফাটল।

আর আলের গর্তে ছিল খেঁকশিয়ালের বাসা। দুম করে কুমড়োটা ফেটেছে তার কাছে। খেঁকশিয়াল ভাবল এ এক বিপদ। ভয়ের চোটে বেচারা গর্ত থেকে বেরিয়ে দৌড়তে শুরু করল। সে তাই দেখে হায় হায় করে উঠল। এই যাঃ! ডিম ভেঙে ঘোড়ার বাচ্চা বেরিয়ে পালাচ্ছে যে! সে খেঁকশিয়ালটার পিছনে দৌড়ে যায় আর চেঁচায়—ঘোড়েকা বাচ্চা ভাগ্‌তা। ঘোড়েকা বাচ্চা ভাগ্‌তা···

এইরকম কত মজার-মজার গল্প চালু আছে করিমকে নিয়ে। আরেকটা শোন, তাহলেই বুঝবে করিম জোলা কত সরল মানুষ ছিল।

তার একটুকরো তরমুজ খেত ছিল। চোরের জ্বালায় বেচারার খেত উজাড় হয়ে যায়। প্রতি রাতে চোর এসে তার খেতে চুপিচুপি হামলা করে। করিম জোলার ঘুমটা এত বেশি যে টের পায় না কিছু।

একদিন সে মনমরা হয়ে আছে, এক ফকির যাচ্ছেন পথে। ফকিরের তেষ্টা পেয়েছিল। পাশের খেতে তরমুজ দেখে ভাবলেন, করিমের কাছে একটা তরমুজ চাইবেন।

করিম ফকিরের অনুরোধে তক্ষুণি একটা পাকা তরমুজ দিল। ফকির তেষ্টা মিটিয়ে খুশি হয়ে বললেন—বলো বাবা, কী চাও ?

করিম জোলা বলল—ফকিরসায়েব, আমার ঘুমটা বড্ড বেশি। রাতে চোরেরা এসে তাই সব তরমুজ চুরি করে নেয়। একটা কিছু উপায় বাৎলে দিন তো ?

…একটা কিছু উপায় বাতলে দিন তো (পৃঃ ৩৮)

ফকির বললেন—ঠিক আছে। রাতের বেলা তোমার কানে একটা আওয়াজ হবে। যদি খেতের কাছে কেউ আসে, অমনি শুনবে—তোমার কান থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে: কে রে, কে রে, কে রে?

সে হাতে চাঁদ পেল। সেদিন থেকে যেমন চোর আসে ঘুমন্ত করিম জোলার কান থেকে আওয়াজ বেরোয়—কে রে? কে রে? কে রে? চোরেরা ভাবে, এই রে! ব্যাটা জেগে আছে! তারা পালিয়ে যায়।

বেশ চলছিল! হঠাৎ এক রাতে একদল ডাকাত যাচ্ছে গেরস্থ বাড়ি হানা দিতে। গাঁয়ের শেষে করিম জোলার তরমুজ খেতের কাছে যেই এসেছে, তারা শুনল—কুঁড়ে থেকে জোলা বলছে—কে রে··· কে রে—কে রে?

তারা তো চোর নয়, ডাকাত। ওতে ভয় পাবে কেন? কুঁড়েয় গিয়ে হামলা করল! লোক জেগে থাকলে ডাকাতি করবে কেমন করে? টের পেয়েই তো সে ডাকাত-ডাকাত বলে চেঁচাবে এবং ঘুমন্ত লোকেরা জেগে যাবে।

কিন্তু কুঁড়েয় গিয়ে তারা অবাক। করিম ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। আর তার কান থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে—কে রে—কে রে—কে রে?

দলপতি করল কী, বুদ্ধি করে একটু খড় গুঁজে দিল তার কানে। ব্যাস, কে রে—কে রে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। দলপতি বলল—লোকটা দেখছি মন্তরবাজ এলেমদার! এমন লোক দলে থাকলে তো ভালই।

তাই করিমকে গুঁতোর চোটে জাগিয়ে দলপতি হুকুম দিল—চল ব্যাটা, আমাদের সঙ্গে তোকে ডাকাতি করতে যেতে হবে!

সরলমনা করিম বেচারা প্রাণের দায়ে তাদের সঙ্গে চলল। গাঁয়ে এক গেরস্থ বাড়ির কাছে তারা হাজির হল। দলপতি বলল—এই এলেমদার মন্তরবাজকে ভেতরে পাঠানো যাক। শোন হে স্যাঙাত!

তুমি সব মালকড়ি সোনাদানা মন্তরের জোরে হাতিয়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ছুঁড়বে আর আমরা কুড়োব।

করিমকে ওরা পাঁচিলে তুলে দিয়ে এক ধাক্কায় ওপারে ঠেলে ফেলল। বেচারা ভেতরে পড়ল। সে কখনও ডাকাতি কি করেছে? পরের বাড়ি ঢুকেছে নিশুতি রাতে? ঠকঠক কাঁপছে।

গেরস্থ তার পাঁচিল থেকে পড়ার শব্দে জেগে গিয়েছিল ওদিকে। লণ্ঠন জ্বেলে বেরিয়েছে ঘর থেকে—কী শব্দ হল দেখতে।

গতিক দেখে করিম গোয়ালঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। একটা গাইগরু তার কানে খোঁজা খড়গুলো দেখামাত্র মুখ বাড়িয়ে টেনে নিল। আর ব্যস! করিমের কান থেকে আওয়াজ বেরুতে লাগল—কে রে—কে রে—কে রে?

তাই শুনে গেরস্থ গোয়ালঘরে এসে ঢুকল। বাড়ির লোকেরাও গেল জেগে। তারপর করিম বেচারাকে ধরে তো দে প্রহার! বেচারা বিনিদোষে মার খেল।—

সে ছিল আসলে যাকে বলে সত্যযুগ। তখন স্বর্গ থেকে দেবতারা আসতেন পৃথিবীতে; দেবরাজ ইন্দ্রের বাহনের নাম ঐরাবত। ঐরাবতও মাঝে মাঝে স্বর্গের জলে চান করে সুখ পেত না—তেষ্টা মিটত না। চলে আসত পৃথিবীতে। জোলাপাড়ার কাছে ছিল একটা দিঘি। সেই দীঘিতে নেমে শুঁড়ে জল তুলে খেলা করত। তারপর স্বর্গে ফিরে যেত।

একদিন হয়েছে কী, ঐরাবত নেমেছে দিঘির জলে—সেই সময় করিম চান করছে। যেই ঐরাবত চান সেরে আকাশে উঠতে শুরু করেছে, সেই তার লেজটা ধরেছে চেপে।

স্বর্গে পৌঁছল ঐরাবত। করিম লেজ ছেড়ে এদিক ওদিক দেখে অবাক। স্বর্গ বলে কথা! এদিকে দেবতা অপ্সরারা মানুষ দেখে ভিড় জমিয়েছেন। সশরীরে মানুষ যখন স্বর্গে এসেছে তখন না জানি কোন মহাপুণ্যবান মহাপুরুষ। সবাই খুশি হয়ে বলেন—কী চাও বৎস, কী চাও বলো?

করিম ভেবেই পেল না কী চাইবে। শেষে বলল—সুতো চাই, হুজুর।

প্রচুর সুতো দেওয়া হল তাকে। তারপর ঐরাবত যখন আবার পৃথিবীতে চান করতে নামছে, তার পিঠে চাপিয়ে দয়ালু দেবতারা করিমকে ফেরত পাঠালেন।

জোলাপাড়ার সবাই ব্যাপারটা দেখে অবাক। এত সুতো দিয়েছেন দেবতারা! তারা করিমকে বলল—ভাই, একদিন ঐরাবত নামলে যেন আমাদের খবর দিও।

যথারীতি ঐরাবত নেমেছে। সে জোলা পাড়া সুদ্ধু খবর দিল। তারপর ঐরাবতের লেজ ধরল। বাকি সব লোক একের পর এক তার পেছনে কোমরের কাপড় আঁকড়ে ধরল। ঐরাবত যখন আকাশে উড়ল, দেখা গেল লম্বা একটা মানুষের শেকল তার লেজ ধরে উঠছে।

কিছুটা ওঠার পর সবার নীচের লোকটি জিজ্ঞেস করল—ভাই কেত্তা সুতা মিলেগা?

করিম তো ছিল লেজ ধরে। সে দুহাত ছেড়ে সুতোর পরিমাণ দেখিয়ে বলল—এত্তা সুতা মিলেগা!

ব্যস, সবাই আকাশ থেকে দুমদাম পড়ে গেল! স্বর্গে যাওয়া হল না তো বটেই, কজনের হাড়গোড় আস্ত রইল সেও ভাববার কথা।

এই গল্পটা কিন্তু সবচেয়ে সরেস।

করিমের বাবার বড় দুঃখ ছিল, সবাই করিমকে বোকা বলে। তার বুদ্ধিসুদ্ধি নিয়ে হাসাহাসি করে। এ কলঙ্ক দূর করতেই হবে। তাই করিমের বাবা ঠিক করল, ওকে শহরে পাঠাবে বুদ্ধি কিনতে। দশটা টাকা দিয়ে পাঠালও।

করিম বুদ্ধি কিনতে গেছে শহরে। বাজারে ঢুকে একখানে দেখে আলুর আড়ত। সে জিগ্যেস করল—এগুলো গোল-গোল দেখতে, কী ভাই? আলুওয়ালা বুঝতে পারল, এ নিশ্চয় সেই করিম। বলল—বলব কেন? টাকা দিতে হবে। তবেই বলব।

করিম দরাদরি করে পাঁচ টাকায় রফা করল।

আলুওয়ালা টাকাটা পকেটে পুরে বলল—বুঝলে ভায়া? ওর নাম আলু।

একটা বুদ্ধি কেনা হল। করিম এগিয়ে যায়। তারপর চোখে পড়ল দালানবাড়ি। একজন রাস্তার লোককে জিগ্যেস করল—এটা কি ভাই? সে লোকটা ছিল ঠক। প্রশ্ন শুনেই বুঝল, এ নিশ্চয় সেই করিম। সেও আলুওয়ালার মতো টাকা চাইল। বাকি পাঁচটা টাকা তাকে দিলে সে বলল—বুঝলে ভায়া? এ হচ্ছে পাকা দাফান।

করিম তো বুদ্ধি কিনে আনন্দে আটখানা হয়ে গাঁয়ে ফিরল। খবর পেয়ে তাকে খুব খাতির করতে থাকল পাড়ার লোকে।

একদিন গাঁয়ের পথে যাচ্ছে রাজার ছেলের বরযাত্রী। হাতীঘোড়া লোকলস্কর বাজনা। করিমের বাবা অবাক। এমন কাণ্ড তো সে কখনও দেখেনি। তাই সে তার বুদ্ধিমান ছেলেকে জিগ্যেস করল—এ কী বলো তো করিম?

বুদ্ধিমান করিম অনেকক্ষণ ধরে বিয়ের মিছিল দেখে-টেখে শেষে গম্ভীর মুখে বলল—হয় গোল আলু, নয়তো পাকা দালান।—

www.boiRboi.blogspot.com

ঘুঘুডাঙার ব্রহ্মদৈত্য

ভূতের স্বপ্ন তো সবাই দেখে! তাই বলে কি ভূত বিশ্বাস করতে হবে? এই হচ্ছে ভবভূতিবাবুর স্পষ্ট কথা। তিনি যৌবনে দুর্দান্ত শিকারী ছিলেন। বনে জঙ্গলে পোড়ো বাংলোয় ঘুরেছেন। কোথায় ভূত?

তাঁর বন্ধু গজপতি গোঁ ধরলেন—আজকাল এই ভিড় হল্লা আলো আর যন্তরের ঠেলায় বেচারী ভূতেরা থাকবে কোথায়? তাই মানুষের স্বপ্নে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে। গজপতি আরও বলেন, উপায়টা কী? মানুষের হাতে আজকাল কত রকম জব্বর অস্ত্রশস্ত্র। অ্যাটমবোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা। তার ওপর কত রকম সাংঘাতিক ওষুধপত্র বেরিয়েছে। তাই ভূতেরা মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নিরাপদে কাটাচ্ছে। স্বপ্নে মানুষ তো একেবারে অসহায় বুঝলে না?

ভবভূতি তা মানতে রাজি নন।

বলেন—হ্যাঁ, একথা সত্যি, সুন্দরবন বাঘ প্রকল্পের অভয়ারণ্যের মতো রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্পের এক অদ্ভুত অভয়ারণ্যে স্বপ্নে ভ্রমণ করে এসেছি। কিন্তু স্বপ্ন ইজ স্বপ্ন। অর্থাৎ স্বপ্ন জিনিসটা জলজ্যান্ত মিথ্যে। যাকে পদ্যে বলে, 'আপন মনের মাধুরী'।

—মাধুরী? বলে গজপতি চোখ কটমট করে তাকান। মাধুরী বলছ?

গজপতিকে অমন করে তাকাতে দেখে ভবভূতি বাঁকা হেসে বলেন—আলবাৎ মাধুরী।

গজপতি বলেন—মাধুরীকে তুমি চেনো?

ভবভূতি অবাক। কী কথায় কী! বলেন—তার মানে?

—মাধুরী ছিলেন আমার পিসতুতো দিদি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল

ঘুঘুডাঙায়। জামাইবাবু ছিলেন রেলের গার্ড। অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। তারপর—

—কিস্যু বুঝলাম না। ভবভূতি বাধা দিয়ে বলেন।

বিরক্ত গজপতি বলেন—কথা শেষ করতে দেবে তো? খালি তক্ক আর তক্ক। ঘুঘুডাঙা রেল ইয়ার্ডের ওদিকে এক একর জায়গায় একটা বাড়ি ছিল জামাইবাবুর। পৈতৃক বাড়ি। ওর মৃত্যুর পর সেই বিশাল বাড়িতে একা মাধুরীদিদি থাকতেন।

ভবভূতি খিক খিক করে বলেন—আর থাকতেন তোমার ৺জামাইবাবু, অর্থাৎ ভূত।

গজপতি রীতিমতো গর্জন করে বলেন—না ব্রহ্মদৈত্য!

—ব্রহ্মদৈত্য! ভবভূতি তাজ্জব হয়ে যান।

—হ্যাঁ উঠোনের কোনায় একটা বেলগাছ। সেই গাছে সে মাঝে মাঝে রাত দুপুরে প্রায় উঠানে পায়চারি করতে নামত। মাধুরীদি জেগে থাকলে বলত—কী গো! গরম লাগছে বুঝি? ব্রহ্মদৈত্য বলত—না গো! আজ সন্ধেবেলা একটা ভোজ ছিল। খাওয়াটা বেজায় রকমের হয়ে গেছে। তাই হজম করার তালে আছি। তো তখন মাধুরীদিদি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে হজমের গুলি দিতে ডাকছেন—নাও গো! টুক করে গিলে ফেলে এক গেলাস জল খেও। সব হজম হয়ে যাবে। ব্রহ্মদৈত্য মস্ত লম্বা কালো হাতখানা জানলা অব্দি বাড়িয়ে দিত। হাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি লোম।

ভবভূতি আরও হেসে বলেন—তুমি দেখেছ?

—না দেখেছি তো কি বানিয়ে বলছি? গজপতি গম্ভীর মুখে বলেন। আমার বয়েস বারো-তেরো হবে। ক্লাস এইটে পড়ি। মাধুরীদির ছেলেপুলে ছিল না বলে আমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। খাটে শুয়ে পিট পিট করে তাকিয়ে ওইসব কাণ্ডকারখানা দেখতুম। বলতুম—ও কে দিদি, যাকে হজমি গুলি দিলে? মাধুরীদি বলতেন, চুপ, চুপ। বলতে নেই।

ভবভূতি বলেন—সে বাড়িটা এখনও নিশ্চয়?

—হুঁ আছে। মাধুরীদি অবশ্য বেঁচে নেই।

—বাড়িতে কে থাকে এখন?

এবার গজপতি বাঁকা হেসে বলেন—যাবে নাকি? বাড়িটা খালি পড়ে আছে। হানাবাড়ি হয়ে গেছে। কতবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল কাগজে। সস্তায় বেচে দিতে চেয়েছিল মাধুরীদির বড় জায়ের ছেলে ত্রিলোচন। সেই এখন বাড়ির মালিক। কিন্তু বাড়ির বদনাম শুনে সবাই পিছিয়ে যায়। তাই বাড়িটা তেমনি খালি পড়ে আছে।

ভবভূতি বলেন—বাড়িটা আমি কিনব।

—বলো কী?

—হ্যাঁ। কিছুদিন থেকে আমি নিরিবিলি জায়গায় একটা বাড়ি খুঁজছি। ইচ্ছে আছে, সেখানে একা থাকব এবং কিছু এক্সপেরিমেণ্ট করব।

—কিসের এক্সপেরিমেণ্ট, শুনি।

ভবভূতি ফের নিজস্ব বাঁকা হাসিটা হেসে বলেন—নিশ্চয় ভূত নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট নয়, কুকুর নিয়ে।

গজপতি প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতো বলেন—কুকুর নিয়ে মানে?

তোমাকে বলিনি। কিছুদিন থেকে আমি কুকুর নিয়ে একটু আধটু গবেষণা করছি। আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে, কুকুরের ভাষা। ওদের যে নিজস্ব ভাষা আছে, তাতে কোন ভুল নেই। সেই ভাষা আমার শেখা চাই-ই।

গজপতি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পর বলেন—তা হঠাৎ এই আজগুবি ব্যাপারটা তোমার মাথায় চাপল কেন শুনি?

ভবভূতি গম্ভীর মুখে বলেন—তুমি তো সারাজীবন খালি আইনের প্রকাণ্ড কেতাব পড়েই কাটালে! আদালত আর জজসায়েব ছাড়া কিস্যু বোঝও না।

কৌতূহলী গজপতি বলেন—আহা, বুঝিয়ে বলো না একটু!

—বললেও বুঝবে কি? তুমি তো ঋগ্বেদ পড়োনি। সরমা ছিলেন কুকুরদের মা। সরমার ছেলেমেয়েদের নাম তাই সারমেয়। দেবতাধিপতি ইন্দ্র সরমাকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন—

গজপতি বাধা দিয়ে বলেন—আহা হলোটা কী তাতে?

ভবভূতি চটেমটে বলেন—হলো তোমার মাথা আর মুণ্ডু! সেযুগে কুকুররাই দূতের কাজ করত বুঝতে পারছ না? তাদের যদি ভাষা না থাকবে তাহলে তাদের দূত করা হল কেন? তা ছাড়া ঋগ্বেদের আরেক জায়গায় আছে, একদল কুকুর কোরাস গাইছে। ভাষা না থাকলে—

ফের গজপতি বাধা দিয়ে খিক খিক করে হেসে বলেন—হুঁ, এখন আমাদের পাড়ায় রাতদুপুরে কুকুরেরা কোরাস গায়। বাপ্‌স্! সে কী কোরাস্!

ভবভূতির এবার গর্জনের পালা।—তুমি মূর্খ! শাস্ত্রজ্ঞানহীন নিতান্ত ইয়ে। নইলে মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বে স্বর্গপথে যুধিষ্ঠিরের পেছন পেছন কুকুর যাওয়ার কারণটাও তুমি বুঝতে! বলো তো, কেন কুকুর পেছন পেছন যাচ্ছিল?

কুকুর এখনও পেছন-পেছন যায়। সেদিন আমি কিলোটাক পাঁঠার মাংস কিনে আনছি, একটা কুকুর পিছু ধরেছিল। গজপতি হাসতে হাসতে বলেন, নিশ্চয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাঁঠার মাংস ছিল। স্বর্গে তো জীবহত্যা নিষেধ। তাই মর্ত থেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভবভূতির পক্ষে এটা অসহ্য। রেগেমেগে বেরিয়ে গেলেন তক্ষুণি। গজপতির পরে হুঁশ হল। তখন বেরিয়ে গিয়ে আদুরে স্বরে ডাকেন—ভবী! ভব! ও ভবা!

কোথায় ভবভূতি? তাঁর মান্ধাতার আমলের খনখনে বিলিতী গাড়ির লেজের ডগাটুকু মোড়ে একবারের জন্যে দেখতে পেলেন গজপতি।

খুব রেগেছে। তা রাগুক। গজপতি মনে মনে বললেন। একটু পরে জল হয়ে যাবে। দুই বন্ধুর এমন রাগারাগি দৈনিক পাঁচসাতবার হয়। আবার মিল হতেও দেরি হয় না!

তবে অন্যবারে রাগ পড়তে ভবভূতি যতটা সময় লাগে, এবার লেগেছিল তারও কম।

এর এক নম্বর কারণ, গজপতির পিসতুতো দিদির সেই হানাবাড়ি কেনার ইচ্ছে!

দু নম্বর কারণ, ভবভূতি ভূত বিশ্বাস করেন না। গজপতির কাছে প্রমাণ করতে চাইছিলেন, ভূত বলতে কিস্যু নেই। সুতরাং গজপতি মিথ্যুক।

তিন নম্বর কারণ, ভবভূতির কুকুর নিয়ে নিরিবিলি গবেষণা!

বাড়িটার মালিক ত্রিলোচন থাকে হাজারিবাগে। ভবভূতির তর সইছিল না। গজপতিকে বলে টেলিগ্রাম করিয়ে তাকে কলকাতায় আনালেন এবং রাতারাতি বাড়িটা কিনে ফেললেন! সস্তায় কিনলেন বলা যায়। ত্রিলোচন যা পেল, তাই লাভ। ঘুঘুডাঙা রেল ইয়ার্ডের ওদিকে কোন ভদ্রলোক গিয়ে বাস করতে চাইবেন? রেল ইয়ার্ডে হরদম ট্রেন মালগাড়ি আর ইঞ্জিনের বিকট বাজখাঁই চেঁচামেচি, তার ওপর ভূত ওরফে ব্রহ্মদৈত্যর গুজব। তবে হ্যাঁ, কারখানার জন্যে কেউ কিনতেও পারতেন। কিন্তু ত্রিলোচনের কাকিমা মাধুরীদেবী নাকি বলে গিয়েছিলেন—কলকারখানা হলে উনি অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য-মশায় রিফিউজি হয়ে যাবেন। খবরদার বাবা তিলু, এই কম্মটি কোরো না! ওতে পাপ তো হবেই, তার ওপর উনি রেগে গিয়ে তোমাদের পিছনে লাগবেন।

তিলু বা ত্রিলোচন গজপতির মতো ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। এছাড়া সে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে। ব্রহ্মদৈত্য-মশাইয়ের চেহারার যা বর্ণনা শুনেছে সে, তাতে তার হাজারিবাগে ছোট্ট বাড়িটার ওপর তিনি গিয়ে একখানা পা রাখলেই পৌরাণিক গল্পের সেই তিনপেয়ে বামনাবতারের বলিরাজার মাথায় পা চাপানোর ব্যাপারটাই ঘটে যাবে। অর্থাৎ চিঁড়েচ্যাপটা যাকে বলে।

যাই হোক, বাড়ি তো কিনে ফেললেন ভবভূতি। খুব পছন্দসই বাড়ি। কতকটা সেকালের কুঠিবাড়ির গড়ন। একতলা এবং উঁচু

ছাদ। সাত-আটটা পাশাপাশি ঘর আছে। তার সঙ্গেই স্নানঘর, রান্নাঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। বাড়ির চারদিকে লম্বাচাওড়া প্রচুর জায়গা। গাছপালা আছে। ঝোপঝাড় গজিয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। চারদিকের পাঁচিল যথেষ্ট উঁচু। একদিকে মস্তো গেট, অন্যদিকে খিড়কির দরজা। গেটের সামনে খোয়াঢাকা অনেককালের অব্যবহৃত রাস্তা আছে একফালি। সেটা গিয়ে মিশেছে রেল ইয়ার্ডের কাছে চওড়া বড় রাস্তার সঙ্গে। সেইদিকে একটু এগোলে ঘুঘুডাঙা রেলস্টেশন।

বিশাল উঠোনের কোণায় পাঁচিল ঘেঁষে সেই প্রকাণ্ড বেলগাছটা দেখতে পেলেন ভবভূতি। আনন্দে নেচে উঠলেন।

না, ব্রহ্মদৈত্যের জন্যে নয়। গাছটা ইয়া মোটা, বেলে ভর্তি। ভবভূতি বেলের সরবত পেলে আর কিছু খেতে চান না। একগাল হেসে গজপতিকে বললেন—গজু, প্রতিদিন বেলের সরবতের নেমতন্ন রইল। এলেই পাবে।

গজপতি মুখে হ্যাঁ বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে বললেন—

—মাথা খারাপ? বেলের সরবতের জন্যে রোজ ট্রেনে চেপে ব্রহ্মদৈত্যর আখড়ায় আসব? আমি তো ভবুর মতো পাগল নই। ঐ বেলে হাত দিলে ব্রহ্মদৈত্যমশাই খড়মপেটা করবে না?

ভবভূতিকে গৃহ-স্থ করতে এসেছিলেন সেই প্রথমদিন। তারপর আর তিনি আসেননি। তবে দৈনিক একটি করে চিঠি লেখেন। লিখেই আশা করেন, এ চিঠির জবাব ভবভূতির বদলে তাঁর রাঁধুনী-কাম-চাকর নরহরিই লিখবে বড় দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—কর্তাবাবু গতরাতে বেলতলায় পটল তুলেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য তাঁর ঘাড়টি মটকে দিয়েছে।

কিন্তু কোথায় কী? দিব্যি ভবভূতিরই জবাব আসে। নিজের হাতে লেখা। প্রিয় গজু, তুমি কি সম্প্রতি ন্যাড়া হইয়াছ? নতুবা আসিতেছ না কেন? প্রচুর বেল পাকিয়াছে। তোমার ব্রহ্মদৈত্য ভদ্রলোকটি বেজায় ভদ্র। তাঁহার সঙ্গে ভাব জমিয়াছে। তিনি ন্যাড়া বলিয়াই

কদাচ বেলতলায় অবতরণ করেন না। মগডালে বসিয়া পাকা বেল পাড়িয়া দেন। আমি লম্বা বাঁশের ডগায় বাঁধিয়া এলুমিনিয়ামের জগভর্তি সরবৎ পাঠাই। ৺তিনি সরবত পান করিয়া জগটি নামাইয়া দেন। হ্যাঁ—গতকাল লিখিতে ভুলিয়াছি, ৺তিনি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। বলিলেন, আহা! বালকটিকে দেখিলে বড় আনন্দ পাইতাম।...

এই চিঠি পেয়ে গজপতি রেগে লাল। চালাকি? ঠাট্টা করা হয়েছে 'বালক' বলে? আমার বয়স পঁয়ষট্টি হয়ে গেল। আমাকে বালক বলা হচ্ছে? আমার গাল টিপলে দুধ বেরোয়, না আমি এখনও দুধুভাতু খাই যে আমাকে বালক বলেছে?

একটু পরে রাগ পড়ে গেল। না, হয়তো ঠিকই লিখেছে। ব্রহ্মদৈত্য মশায় আমাকে সেই ছেলেবয়সে দেখেছেন। তাই বালক বলাটা স্বাভাবিক। হয়তো সত্যিসত্যি ভবভূতি ওনার দর্শন পেয়েছে। এবং পেয়ে এতদিনে ভূতপ্রেতে বিশ্বাসও হয়েছে।

তাহলে ভয়ের কথা, ব্রহ্মদৈত্য এখনও মনে রেখেছেন গজপতিকে? ওরে বাবা, এযে সাংঘাতিক কথা। আজই কালিঘাটে পুজো দিয়ে আসতে হবে। হে মা কালী, যেন 'বেলগাছিয়াবাসী' কালো কুচকুচে, সর্বাঙ্গে লোমওয়ালা এবং খড়ম-পরা ৺ভদ্রলোকটি আমাকে ভুলে যান। ওনার স্মৃতিভ্রংশ করিয়ে দাও মা!

না ভুললেই বিপদ। হয়তো ভবভূতিই তাঁকে প্ররোচিত করবেন গজপতির বাড়ি আসতে এবং তিনি নিছক স্নেহ-প্রদর্শনেই খড়ম পায়ে চট চট করে রাতদুপুরে হাজির হয়ে হেঁড়ে গলায় ডেকে বলবেন-গঁজু! কেমন আঁছিস বাঁবা?

গজপতি আঁতকে উঠে তক্ষুণি কালিঘাট ছোটেন।—

ওদিকে ভবভূতি চমৎকার কাটাচ্ছেন ঘুঘুডাঙার বাড়িতে।

বাড়ির নাম দিয়েছেন: 'সরমা'। ঋগ্বেদের সেই কুক্কুর জননী সরমা। তলায় ব্রাকেটে ইংরেজিতে লেখা আছে: দি ডগ রিসার্চ সেন্টার।'

পূর্ব দক্ষিণের একটা ঘরে থাকেন ভবভূতি। তাঁর পাশের ঘরে নরহরি ঠাকুর। তার ওপাশে রান্নাঘর। উত্তর পশ্চিমের মস্তো ঘরে রেখেছে পাঁচটা অ্যালসেশিয়ান, দুটো গ্রেহাউণ্ড, তিনটে টেরিয়ার, আর সাতটা দিশি কুত্তা। এই সাতটা দিশি কুত্তার মধ্যে দুটো বাঘা, দুটো খেঁকি আর বাকি তিনটে নেড়ী। রীতিমতো আন্তর্জাতিক বাহিনী।

ক'দিনের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার ডেকে এনে ওই ঘরটা সাউণ্ড প্রুফ করে নিয়েছেন। তার ফলে যতই চ্যাঁচামেচি করুক, বাইরে থেকে একটুও শোনা যাবে না।

মোট সতেরটা কুকুরের জন্যে সতেরটা কাঠের খাঁচাঘর আছে। সামনে লোহার গরাদ। চিড়িয়াখানায় যেমন বাঘের খাঁচা দেখা যায়, ঠিক তেমনি।

দেখাশোনা, খাওয়ানো, স্নান করানো—সবকিছুর ভার ভবভূতি নিজে নিয়েছেন। নরহরি কুকুর দেখলেই উল্টোদিকে দৌড়ায়। তাই পারতপক্ষে এ ঘরে ঢোকে না।

ভবভূতি একটা প্রকাণ্ড নোটবইতে দুবেলা কুকুরগুলোর হাবভাব টুকে রাখেন। টেপ রেকর্ডারও আছে। কুকুরদের ডাক রেকর্ড করেন। পরে নিজের ঘরে গিয়ে টেপ বাজিয়ে শোনেন! গম্ভীর মুখে ভাবনা চিন্তা করেন। লেখেন। রীতিমতে গবেষণা কি না!—

বেশ চলছিল এই রকম। রাতে কুকুরশালায় টেপরেকর্ডার চালিয়ে রাখছিলেন এবং সকালে নিয়ে এসে বাজিয়ে শুনেছিলেন। নোট করছিলেন কোন বৈশিষ্ট্য আছে নাকি। জীবজন্তুর ভাষা শেখা তো সহজ কথা নয়। টেপের একটা জায়গা বারবার বাজিয়ে শুনে তবে না কিছু বোঝা যাবে!

হঠাৎ একদিন সকালে টেপ বাজিয়ে শুনতে শুনতে ভবভূতি অবাক হলেন।

টেপে সতেরটা কুকুরের নানান হাঁকডাক অন্যদিন যেমন শোনেন, তেমনি শুনতে পাচ্ছিলেন। তারপর কী একটা ঘটল। আচমকা ওরা চুপ করে গেছে। কোন ডাক নেই। না ঘড়ঘড়, গরগর গাঁগোঁ,

খ্যাঁক খ্যাঁকা, ঘেউঘেউ, কিংবা ভ্যাক্‌ভ্যাক্‌। হঠাৎ বেড়ালের মতো যেন মিউ গোছের মিহি নরম ডাক ডেকেই সবাই থেমে গেছে। গেছে তো গেছেই।

তারপর একটা কেমন শনশন শব্দ হল। তারপর ঘট ঘটাং!

তারপর খট্‌ খট্‌, খট্‌ খট্‌, খট্‌ খট্‌—

শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ থেকে জোরালো হয়ে বাজতে থাকল টেপে। তারপর থেমে গেল। কিসের শব্দ হতে পারে?

তারপর চক্‌চক্‌ চকাম্‌ চকাম্‌—কুকুরগুলো খাবার সময় যেমন শব্দ করে, সেইরকম! বেশ তালে তালে শব্দগুলো বাজছে। ভোজের আসরে শেষপাতে চাটনির সময় চোখ বুজলে যেমন শোনা যায়। এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! কুকুরগুলোর তো এত রাতে কিছু খাবার কথা নয়! খাবে যে, তা পাবেটা কোথায়?

অথচ শোনা যাচ্ছে, গত রাতে। (হিসেব মতো তখন প্রায় বারোটা) ওরা খুব খাচ্ছে। খাচ্ছেটা কী? চাটনি? অসম্ভব। কুকুর তো চাটনি খায় না। চেটেপুটে খায় অবশ্য। কিন্তু চাটবেই বা কী? নিজের-নিজের লেজ? মনে হয় না তা। ভবভূতি কুকুরের লেজ চেটে না দেখলেও জানেন, মোটেও সুস্বাদু নয়।

ভবভূতি টেপ বন্ধ করে কুকুরশালায় ঢুকলেন। তাকে দেখে কুকুর-গুলো কিন্তু অদ্ভুত আচরণ শুরু করল! ঘণ্টাটাক আগে এ ঘরে ঢুকেছেন! খাইয়েছেন। টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিয়ে গেছেন। তখন ওরা স্বাভাবিক ছিল। অথচ এখন ওঁকে দেখে প্রত্যেকটা কুকুর গরগর করে উঠেছে। কুকুরের ভাষা এতদিনে যতটা বুঝেছেন, ওদের এই শব্দে রীতিমতো রাগ আছে। সবচেয়ে বেশি আদরের অ্যালসেশিয়ানটার খাঁচার সামনে যেতেই সে দাঁত বের করে কামড়াতে এল। গ্রেহাউণ্ড দুটো শরীর লম্বা করে গাঁ গাঁ করতে থাকল।

তারপরই প্রত্যেকটি খাঁচায় প্রত্যেকটি কুকুর লাফালাফি জুড়ে দিল। যেন খাঁচা ভেঙে ফেলবে। তাঁকে পেলে যেন ওরা টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। সে কি হিংস্র হাঁকরানি!

ভবভূতি বিলিতিগুলোকে ইংরিজিতে এবং দেশীগুলোকে বাংলায় তর্জন-গর্জন সহকারে ধমক লাগালেন। একটা লাঠি নিয়ে এসে খুব ঠোকাঠুকি করলেন খাঁচার সামনে। কিন্তু কেউ ভয় পেল না বরং আরও ক্ষেপে গেল। ভবভূতির কানে তালা ধরে যাচ্ছিল ওদের চ্যাঁচামেচিতে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্যে। এমন তো করে না ওরা। ব্যাপার কী?

অসহ্য লাগলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। খুব রাগ হয়েছে। বেইমান নেমকহারাম! এত যত্ন করে রাখা হয়েছে! রোজ কাঁড়িকাঁড়ি দুধ, মাংস এইসব খাওয়ানো হচ্ছে। আর তার বদলে এই ব্যবহার!

রোস, আজ সারাদিন খাওয়া বন্ধ।

নিজের ঘরে ফিরে আবার টেপ বাজিয়ে রাতের রেকর্ড হওয়া শব্দগুলো শুনতে থাকলেন ভবভূতি। এই খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দটা কিসের হতে পারে?

হঠাৎ চমকে উঠলেন। তাহলে কি ওটা খড়মের শব্দ?

অর্থাৎ বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্য?

তাহলে কি সত্যি ব্রহ্মদৈত্য বলে কিছু আছে? এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যই কি কুকুরগুলোকে রাতে কিছু খাইয়ে বশ করে ফেলেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে?

অথচ সকালে যখন দুধ পাঁউরুটি খাওয়াতে গেলেন, তখন ওরা শান্তভাবে ছিল। এর মানে কী?

ভবভূতির মনে হল, নেহাত খাবার লোভে তখন জন্তুগুলো তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। নেমকহারাম লোভী স্বার্থপর!

ভবভূতি যত ভাবলেন ব্যাপারটা, বিচলিত বোধ করলেন। ঠিক আছে, আজ রাতে তিনি জেগে থেকে পাহারা দেবেন। নরহরিকে সঙ্গে নেবেন। এ রহস্যের ফর্দাফাই না করলেই চলে না।

নরহরিকে ডেকে সব খুলে বললে তার মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাকে ওই বেলগাছের ব্যাপারটা এতদিন বলেননি।

এটাকে যে হানাবাড়ি বলতো লোকে, তাও জানে না সে। কেমন করে জানবে? সে সেই বাঁকুড়ার লোক। ভবভূতির জামাই তাকে শ্বশুরের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জামাই ওখানে রোডস দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। শ্বশুরমশায়ের নানান উদ্ভট বাতিকের কথা জানেন তিনি। কেমন লোক পছন্দ হবে, তাও জানেন। ভবভূতির কোন কথায় না করবে না এবং কোন ব্যাপারে অবাক হবে না—এমন লোক চাই। সেদিক থেকে নরহরি উৎকৃষ্ট। সবেতেই মুণ্ডু কাত করে বলে—ইয়েস স্যার!

কর্তাবাবুর কথার বিরুদ্ধে অন্য কথা বলার যো নেই। সে মুখে সায় দিল। বরং জাঁক দেখিয়ে বলল—বেহ্মদত্যির টিকি আর টাক দুই-ই কেড়ে নেব স্যার।

খুশি হয়ে ভবভূতি বললেন—একখানা মোটা লাঠি জোগাড় করে রাখো। আর একটা বস্তায় পাটকেল রাখো। টিকি আর টাক কাড়তে গিয়ে মামলায় পড়বে হে! গবু উকিল তাক করে বসে আছে ওদিকে।

ওদিকে কুকুরগুলো উপোস করছে। করুক। ভবভূতি রাতের খাওয়া শেষ করে নরহরিকে সঙ্গে নিয়ে চুপিচুপি ওপাশের দরজায় বের হলেন। জ্যোৎস্না রাত। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেলগাছটার একটু তফাতে একটা জঙ্গল-হয়ে-যাওয়া জবাগাছের আড়ালে দুজনে ওঁৎ পেতে বসে রইলেন। সঙ্গে একটা বন্দুকও নিয়েছেন। লাঠি আর পাটকেলের বস্তাও আছে।

বসে আছেন তো আছেন। সব নিস্তব্ধ। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পশ্চিমের রেলইয়ার্ড থেকে রেলগাড়ির শব্দ কিংবা হুইসেল শোনা যাচ্ছে। আবার সব চুপ। হেমন্তকাল। শিশিরে ঘাস গাছপালা ভিজে জবজব করছে। হাল্কা কুয়াশা জমেছে গাছপালায়। কিছুক্ষণ পরে বেলগাছ থেকে একটা পেঁচা ডাকল—ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও!

তারপর মনে হল বেলগাছটায় হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়া এসেছে।

শনশন করে ডালপালা নড়ছে। তারপরই ভবভূতি দেখতে পেলেন, ঠিক মগডালে কালো প্রকাণ্ড একটা মানুষের মতো কে উঠে দাঁড়াল এবং চাঁদের দিকে তাকিয়ে যেন হাই তুলে বার তিনেক বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে তুড়ি দিল।

তারপর হেঁড়ে এবং চাপা গলায় সেই মূর্তিটা বলে উঠল—হরি হে দীনবন্ধু। পার করো হে ভবসিন্ধু।...তারা! ব্রহ্মময়ী মা গো! জগদম্বা বলো মন হে! জগদম্বা বলো!

নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ভবভূতি। তাঁর পিছনে বসে নরহরি ঠকঠক করে কাঁপছে। তাকে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলেন একবার।

একটু পরে মূর্তিটা গাছের ডগা থেকে লাফ দিয়ে নামল। মাটি কেঁপে উঠল যেন। জ্যোৎস্নায় এলে স্পষ্ট দেখা গেল, তার পরনে কোঁচা করে পরা খাটো ধুতি, খালি গা, বুকে পৈতে রয়েছে। মাথার চুল ছোট করে কাটা। একটা প্রকাণ্ড টিকি আছে।

হ্যাঁ, খড়মের শব্দ হচ্ছে। খট্ খট্ খট্ খট্! ভবভূতি দেখলেন সে তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। শিউরে উঠলেন। কিন্তু তিনি এক সময়কার শিকারী মানুষ। এমনিভাবে বন্দুক হাতে কতবার গহন অরণ্যে বাঘের এলাকায় রাত কাটিয়েছেন। এ কিছু নতুন ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। দেখা যাক।

অবশ্য এবার বাঘ নয়, ব্রহ্মদৈত্য এই যা।

ব্রহ্মদৈত্যকে কাছে থেকে ভাল করে দেখবেন বলে চুপচাপ বসে আছেন ভবভূতি। নরহরির সাড়া নেই। চোখ বুজে ফেলেছে। নাকি ভিরমি গেল, ভবভূতির ঘুরে দেখার সময় নেই।

ব্রহ্মদৈত্য এসে ভবভূতির মাথার ওপর জবাগাছ থেকে টুপ করে একটা জবাফুল পেড়ে নিল। নিয়ে টিকিতে বোঁটাটা গিঁট দিয়ে বাঁধল। কী বোঁটকা গন্ধ। ভবভূতির অসহ্য লাগল। নাকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। আর এতক্ষণে দেখলেন, ব্রহ্মদৈত্যের হাতে একটা হাঁড়ি রয়েছে। তারপর দেখলেন ব্রহ্মদৈত্য তাঁর কুকুরশালার

দিকেই চলেছে। খড়মের শব্দ হচ্ছে খট্ খট্ খটাং! হাঁড়িতে কী থাকতে পারে? তাছাড়া ও ঘরে ঢুকবেই-বা কী ভাবে? ভেবেই পেলেন না ভবভূতি।

কুকুরশালার বাইরের দরজার কাছে গিয়ে ব্রহ্মদৈত্য হেঁড়ে গলায় ফের বলে উঠল—হরি হে দীনবন্ধু! পার কর হে ভবসিন্ধু।...তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা গো!...জগদম্বা বলো মন হে, জগদম্বা বলো!

তারপর যেন তিনবার তুড়ি দিল সে। অমনি অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে গেল। তখন ব্রহ্মদৈত্য হাঁড়িটা উঁচু করে ধরে যেই ঢুকতে যাচ্ছে, ভবভূতি আর সহ্য করতে পারলেন না। গর্জে উঠলেন—খবর্দার!

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মুখো বন্দুক তুলে ছুঁড়লেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—নরহরি! ঢিল ছোড়ো! লাঠি চার্জ করো! এক হাতে ঢিল, অন্য হাতে লাঠি!

ঘুরে দেখেন, কোথায় নরহরি? কেউ নেই পিছনে। পাটকেলের বস্তা আর লাঠিটা পড়ে আছে। রাগে ভবভূতি বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে এবং লাঠি ও বন্দুক বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন।

ওই অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে ফাঁকায় দাঁড়ালেন। ওদিকে ব্রহ্মদৈত্য তখন দরজা থেকে কেটে পড়েছে। খড়ম পায়ে দৌড়ে আবার বেল-গাছটার দিকে তাকে যেতে দেখলেন ভবভূতি।

একলাফে বেলগাছে উঠে পড়েছে ব্রহ্মদৈত্য।

ভবভূতি বস্তা নামিয়ে গাছের দিকে পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে গর্জাতে থাকলেন—গেট ডাউন! গেট ডাউন রাস্কেল! নেমে এস বলছি!

বস্তার পাটকেল শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় গাছ থেকে ব্রহ্মদৈত্য করুণ স্বরে বলে উঠল—ভব! ভবী! ভবু! আর ঢিল ছুঁড়োনা ভাই! মাইরি, মরে যাব!

ভবভূতি চমকে উঠলেন।

গলাটা এতক্ষণে চেনা মনে হচ্ছে। দৌড়ে গাছতলায় গিয়ে বললেন—কে? কে তুমি?

আবার করুণ স্বরে জবাব এল—আমি, আমি। উহুহুহু! গেছিরে বাবা।

—কে আমি? নেমে এস বলছি! নৈলে এবার লাঠি পেটা করব! বলে ভবভূতি সেই ইয়া মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরল!

ব্রহ্মদৈত্য কান্নার সুরে বলল—নামতে পারচি না। তোমার ঢিল লেগে হাঁটুর বাতটা হঠাৎ চাগিয়ে উঠেছে! উহু হু হু!

এতক্ষণে ভবভূতির সংশয় ঘুচল। লাঠি ও বন্দুক মাটিতে রেখে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হো হো করে হেসে বললেন—রোস। হাত বাড়াও। ধরে নামাচ্ছি।

ব্রহ্মদৈত্য গুঁড়ির ওপরে বসে আছে। হাত বাড়িয়ে দিল। ভবভূতি তার হাত ধরে সাবধানে নামতে সাহায্য করলেন।

নেমেই ব্রহ্মদৈত্য হাঁটুর ব্যাথা ভুলে চেঁচিয়ে উঠল—এই সেরেছে। হাঁড়িটা পড়ে আছে যে! সর্বনাশ! নির্ঘাৎ ব্যাটা এতক্ষণ আদ্ধেক সাবাড় করেছে।

বলে সে কুকুরশালার দরজার দিকে দৌড়ল। ভবভূতিও তার সঙ্গে দৌড়লেন।

গিয়ে দেখেন, ব্রহ্মদৈত্য নরহরির কাঁধ আঁকড়ে ধরেছেন, আর নরহরি হাঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। টানাটানিতে তাকে নড়ানো যাচ্ছে না। ভবভূতি দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে বললেন—রসগোল্লা নাকি?

—হ্যাঁ। পাক্কা তিন কিলো মাল। ব্যাটা সব সাবাড় করে ফেললে দেখছ না? এ যে আস্ত রাক্ষস!

—বেশ করেছে। ভবভূতি রেগে বললেন।

ব্রহ্মদৈত্য বলল—ইয়ার্কি? ওর জন্যে এনেছিলুম নাকি?

ভবভূতি গর্জে উঠলেন—তোমার নামে মামলা করব! তুমি আমার কুকুরগুলোকে রসগোল্লা খাইয়ে আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী

করে তুলেছ। সকাল হতে দাও। দেখাচ্ছি মজা। সটান ঘুঘুডাঙা আদালতে গিয়ে তোমার নামে মামলা করব।

ব্রহ্মদৈত্য, হাসল। হুঁ! আমাকে মামলার ভয় দেখাচ্ছ। আমি চল্লিশ বছর ওকালতি করেছি জানো না বুঝি?

হ্যাঁ, তাও বটে। ভবভূতি ভড়কে গেলেন। বললেন—তাই বলো এই বুড়ো বয়সে কেলেঙ্কারি করতে তোমার লজ্জা হল না? ছিঃ!

—কিসের লজ্জা? ব্রহ্মদৈত্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্বয়ং গজপতি বাঁকা হেসে বললেন। তুমি যে ব্রহ্মদৈত্য মানো না! এবার মানলে তো?

ভবভূতি পাল্টা বাঁকা হেসে বললেন—হুউ, মানলুম। তবে যাও, এখন চান করে গায়ের কালো কালিগুলো ধুয়ে এস। নৈলে তোমায় বিছানায় শুতে দেব ভেবেছ? ছ্যা ছ্যা!

নরহরি ঠাকুর হাঁড়ি শেষ করে এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আসুন গো। টিউবেল থেকে জল টিপে দিই। চান করবেন। আমারও তেষ্টা পেয়েছে।...

এই ঘটনায় দুটো ফল হল। এক: নরহরি গোপনে গজপতির চক্রান্তে যোগ দিয়েছিল এবং কুকুরশালার চাবিও চুরি করে ওকে দিয়েছিল বলে তার এখানকার চাকরি গেল। সে অবশ্য গজপতির বাড়ি ফের চাকরি পেল। তাই কথা ছিল গজপতির সঙ্গে।

দুই: ভবভূতিকে কুকুরগুলোর জন্যে দৈনিক তিন কিলো করে রসগোল্লার ব্যবস্থা করতে হল। রসগোল্লার মজা ওরা পেয়ে গেছে। একদিন না পেলে ভবভূতির বিরুদ্ধে সেদিনের মতো প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখায়।

ভবভূতি নতুন লোক বহাল করেছেন। তার নাম কালীপদ। ডাক নাম কালো। বছর বিশ বাইশ বয়সের এক ছোকরা। ভারি অমায়িক এবং বিশ্বাসী। তাকে কুকুরগুলো বেশ পছন্দ করে ফেলেছে। এটা ভবভূতিরও বাড়তি লাভ বলা যায়।

আর গজপতির সঙ্গে সম্পর্ক ? এবার চিড় খেয়েছে সত্যিসত্যি। গজপতির সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া হয়ে গেছে ভবভূতির। ব্রহ্মদৈত্য আছে তা প্রমাণের জন্যে যে এমন কাণ্ড করতে পারে, সে কি মানুষ ? সে নিজেই ভূত। অতএব ভূতে-মানুষে কি বন্ধুত্ব হয় ? কিংবা হয়ে গেলেও কি তা বেশিদিন টেঁকে ?

ভবভূতি মন দিয়ে কুকুরের ভাষা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। গজপতিকে মন থেকে একেবারে মুছেই ফেলেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা—বেলগাছে যদি গজপতির বদলে সে রাতে সত্যিসত্যি ব্রহ্মদৈত্যকেই দেখতে পেতেন, তাহলে কী ঘটত ? একটু শিরশির করে শরীর। বিশেষ করে কোন-কোন রাতে লনে পায়চারি করতে-করতে বেলগাছটার দিকে তাকালে যেন মনে হয় কেউ ওর মধ্যে ঘাপটি পেতে বসে আছে। বাগে পেলেই ঘাড় মটকাবে। তখন ভবভূতি বন্দুকটা নিয়ে এসে খামোকা আকাশে একটা গুলি ছোড়েন। সেই আওয়াজে ভয় পেয়ে বেলগাছের পেঁচাটা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে উড়ে পালায়।

ততদিনে কুকুরের ভাষা নিয়ে গবেষণায় অনেকটা এগিয়েছেন ভবভূতি। ইয়া মোটা লাল কাপড়ে বাঁধানো খেরোর খাতায় কুকুরের ডাকগুলো টুকেছেন এবং তার পাশে বাংলা অনুবাদও করে ফেলেছেন।

এমন কি ওদের সঙ্গে ইদানীং ওদের ভাষাতেই কথা বলার চেষ্টা করছেন।

অ্যালসেশিয়ানের খাঁচার সামনে গিয়ে বলেন, গরর্‌র্‌ গঁঃ। অর্থাৎ কেমন আছ হে ?

সে জবাব দেয়—গঃ গর্‌র্‌র্‌র্‌ গ্যাঁঃ। ভালই আছি। তবে খাঁচায় আটকে থাকাটা ভাল মনে হচ্ছে না।

ভবভূতি একটু হেসে বলেন—গঃ ঘঃ। ঠিক আছে। শিগগির ছেড়ে দেব।

টেরিয়ার দুটো তাঁকে দেখে বলে—ঘেঃ ঘেঃ। ছেড়ে দাও না ব্রাদার।

ভবভূতি বললেন—ঘঁঃ। সবুর, সবুর। দেব বইকি।

গ্রে হাউণ্ড ভারি রাগী। বলে—খ্যাঁ খ্যাঁ খ্যাঁঃ খুঁঃ! ছেড়ে দাও, নয়তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

ভবভূতি বলেন—চুঃ চুঃ! সোনার ছেলে, লক্ষ্মীছেলে? রাগ করে না।

দিশি কুকুর বাঘা, খেঁকি এবং নেড়ি তাঁকে দেখে চ্যাঁচামেচি করে বলে—ভৌ ভৌ ভেউ ভু-উ-উ-উ। কেন আটকে রেখেছ! আমাদের কষ্ট হচ্ছে না বুঝি?

ভবভূতি জবাব দেন—ঘেউ ঘেউ ঘেক্ ঘেক্ ঘুঃ? বেশি চেঁচিও না তো বাপু! সময় হলেই ছাড়ব।

নতুন রাঁধুনী-কাম-চাকর কালীপদ ব্যাপারস্যাপার দেখে হতভম্ব। আজকাল কর্তাবাবু আপন মনে ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন আর কুকুরের মতো ডাকেন। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো?

সেদিন কালীপদ গেছে চা নিয়ে। বই পড়তে পড়তে বললেন—গেঃ গঃ! ঘেউ-উ-উ-উ!

কালীপদ হতভম্ব হয়ে বলেন—কী বলছেন স্যার?

ভবভূতি একটু হেসে বললেন—তাইতো! তুমি এ ভাষা জানো না বটে। শোন কালীপদ, আমি কুকুরের ভাষায় দিব্যি কথা বলতে পারি। একটা বই লিখব ভাবছি। ওটা পড়লে সবাই এ ভাষা শিখে নেবে। তা শোন তুমি বরং আমার কাছে রোজ এ ভাষাটা শিখতে থাকো। বেশি কথা খরচ করতে হবে না। একটুও ক্লান্ত হবে না কথা বলতে। কত সহজে একটা শব্দে অনেক বেশি কথা বলা যায় জানো?

কালীপদ ছেলেটি ভারি সরল। বলল—তাহলে আজই শেখাতে শুরু করুন স্যার।

ব্যস, ভবভূতি ওকে নিয়ে পড়লেন। রোজ দু ঘণ্টা করে মনোযোগী ছাত্রের মতো সে কর্তাবাবুর কাছে বসে কুকুরের ভাষা শেখে। রান্না-ঘরে গিয়ে আপন মনে অভ্যাস করে। জিভ তালুতে ঠেকিয়ে কিভাবে

কিভাবে ঘেউ করতে হয়, সহজেই রপ্ত করে নেয়। রান্নাঘর থেকে অনেক সময় তার সেই ঘেউ শোনা যায়। ভবভূতি তাঁর ঘর থেকে সাড়া দিয়ে বলেন—ঘেউ ঘেউ ঘোঃ। বাঃ। বহুত আচ্ছা। ঠিক হচ্ছে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, দুজনে আর মানুষের ভাষায় কথা বলছেন না। স্রেফ কুকুরের ভাষায় কথা চলছে।

কারণ ভাষাশিক্ষার তাই নিয়ম! যেমন কিনা ইংরাজি স্কুলে যারা পড়ে, তাদের সব সময় ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। তাছাড়া সেই যে একটা কথা আছে—যদি ইংরেজি শিখতে চাও, তাহলে ইংরেজিতে কথা বলো, ইংরেজিতে স্বপ্নও দেখ।'

কুকুরের ভাষায় আজকাল দুজনে স্বপ্ন দেখতেও চেষ্টা করেন বইকি?

আর এই ভাষার নামও খুঁজে পেয়েছেন ভবভূতি। 'শ্বান' ভাষা। শ্ব হল কি না কুকুর। তাদের ভাষার নাম 'শ্বান' ভাষা।

যে গোয়ালা রোজ 'সরমা' অর্থাৎ ভবভূতিবাবুর বাড়িতে দুধ দিতে যায় সে আবাক হয়ে শোনে, ভবভূতি বলছেন—ঘৌ ঘৌ ঘঃ?

কালীপদ জবাব দিচ্ছে—ঘর্‌র্‌র্‌র্ ঘ্যাঃ।

—ভেঁক্ ভেঁক্।

—ভেউ—উঁ—উ।

—গঁঃ গঁ গঁ্যাও!

—গঁ্যা—এঁ্যা এঁ্যা।

গোয়ালা কালীপদকে চুপিচুপি বলে ব্যাপারটা কী ভাই কালীপদ?

কালীপদ মুচকি হেসে বলে—গরগরর! ঘেউ!

গোয়ালা বেচারা ঘাবড়ে যায়। বাইরে ব্যাপারটা রটায় সে। তাই 'সরমার' গেটে কৌতূহলী লোকেরা ভিড় জমায়। বিরক্ত ভবভূতি তাড়া করে বলেন—ঘরররর্ ঘেঁউ ঘেঁউ। ঘ্যাঁ।

লোকেরা ভাবে নির্ঘাৎ পাগল এই ভদ্রলোক। তারা হো হো করে হাসে এবং ভেংচি কেটে কুকুরের মতো ভেউ ঘেউ করতে থাকে। তখন ভবভূতি বন্দুক বের করেন। তারা পালিয়ে যায়।

এই খবর গিয়েছিল গজপতির কাছে। শুনে গজপতি তো ভাবনায় পড়ে গেলেন। হাজার হলেও তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ভবভূতি। বুড়ো বয়সে হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়াটা মোটেও কাজের কথা নয়।

বুদ্ধি খাটিয়ে একদিন গজপতি এক সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে ঘুঘুডাঙায় হাজির হলেন। ইনি কুকুর সম্পর্কেও জ্ঞানী। হণ্ডুরাসে তিনবছর কুকুর বিদ্যা শিখে এসেছেন।

'সরমা'র গেটে গিয়ে ডাকলেন—ভব! ভবী। ভবু! আছ নাকি ভায়া?

ভবভূতি কিন্তু গজপতির জন্যে মনে মনে ছটফট করছেন। আহা, কত কালের বন্ধুত্ব। তার ওপর এমন শ্বান ভাষায় তাঁর কৃতিত্ব গজপতির কাছে জাহির না করলে কি চলে?

গজপতির ওপর সব রাগ ভুলে হাসিমুখে গেটে গিয়ে সম্ভাষণ করলেন—গর্‌র্‌র্‌ গর্‌র্‌।

গজপতি ডাক্তারবাবুকে চিমটি কেটে দিলেন। অর্থাৎ দেখছেন এবং শুনছেন তো? ডাক্তার মুচকি হেসে ফিসফিস করে বললেন—এই রোগের কুকুরামি। দেখেছি হণ্ডুরাসে অনেকেরই আছে।

গজপতিকে গেট খুলে ভবভূতি ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—গঁঃ গঁঃ!

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন—ঘঁ-খ-অ-অ! ঘঁ্যা!

গজপতি অবাক। আরও অবাক হলেন ঘরে গিয়ে। ডাক্তার ভদ্রলোকও ভবভূতির মতো পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

ভবভূতি আর ডাক্তার কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ গর গর করে যাচ্ছেন সমানে। সেই সময় কালীপদ চা নিয়ে এসে বলল—ভৌ ভৌ ভঃ।

গজপতির এতক্ষণে রাগ হল। আর রাগের চোটে ভেংচি কেটে বলে উঠলেন—ভৌ ভৌ ভ্যাঁও।

অমনি কালীপদ তাঁর পায়ের ধুলো নিল। আর ভবভূতি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে একগাল হেসে বলে উঠলেন—ঘঁর্‌র্‌র্‌র্‌ গর্‌র্‌র্‌র্‌ গঁঃ।

এবার অসহ্য লাগল গজপতির। বললেন—কী ব্যাপার বল তো ভায়া ভব? তোমরা সবাই কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছ কেন?

ভবভূতি মুচকি হেসে তাঁর খেরোর খাতাটি সামনে খুলে ধরলেন। চোখ বুলিয়ে গজপতি সব টের পেলেন এতক্ষণে। একের পর এক পাতা উল্টে গোটাটা দেখে নিলেন। তারপর হাসিমুখে ভবভূতির দিকে তাকিয়ে বললেন—ঘঁউউ! ঘঁঃ!

গজপতির সঙ্গে ভবভূতির আবার ভাব হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে গজপতি প্রায়ই 'সরমা'তে বন্ধুর কাছে এক এক বেলা কাটিয়ে যান এবং 'শ্বান' ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আর সেই কুকুর-বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের নাম ডাঃ লম্বোদর হোড়। সংক্ষেপে ডাঃ এল হাউর। তাঁকে মোটা মাইনেতে বহাল করেছেন ভবভূতি। কুকুর গুলোর মাথাধরা, কান কটকট, পেট ফাঁপা ইত্যাদি অসুখবিসুখ তো হয়। এতদিন নিজে তাঁর সাধ্যমতো চিকিৎসা করতেন ভবভূতি। এখন ডাঃ হাউর তা করেন। উনি হাণ্ডুরাসী পদ্ধতিতেই চিকিৎসাটা করেন। তাঁরই পরামর্শে কুকুর বাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তারা খাঁচায় এতদিন বাস করে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে চায় না। খাঁচায় গিয়ে ঢোকে। বাইরে যতক্ষণ থাকে, চুপচাপ উদাস চোখে শুধু আকাশ দেখে আর হাই তোলে।

এতে একটা দারুণ রকমের কাজ হয়েছে। লোকেরা এই বাড়িটা পাগলাগারদ ভেবে পাগল দেখবার জন্যে ইদানীং গেটের পাশে উঁকিঝুঁকি মারত। এখন বাড়ির ত্রিসীমানায় এলেই সতেরটা কুকুর নিজ-নিজ কণ্ঠস্বরে গর্জন করে ওঠে। আর গ্রেহাউণ্ড কী সাংঘাতিক কুকুর, সবাই জানে।

আর কেউ বাড়ির আনাচে-কানাচে আসতে সাহস পায় না। বিকেলে দেখা যায় ভবভূতি আর ডাঃ হাউর সতেরটা দেশী-বিদেশী কুকুর নিয়ে বাড়ির বিশাল প্রাঙ্গণে বেরিয়েছেন এবং কুকুরগুলোকে হাডুডু খেলা শেখাচ্ছেন। বিদেশী কুকুরগুলো দিব্যি হা-ডু-ডু-ডু হাঁকতে পারে। কিন্তু দিশি বাঘা-নেড়ি-খেঁকিরা ওই ইংরিজি

বলতেই পারে না। তারা দিশি ভাষাতেই বলে—চু কিট্ কিট্ কিট।...

সূর্য ডুবে যায় গাছপালার আড়ালে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসে। তখন ডাঃ হাউর কুকুরদের নিয়ে কুকুরশালায় ঢোকেন। আর ডঃ ভবভূতি চুপচাপ পায়চারি করেন কতক্ষণ। চারদিকে নিঝুম। মনে কত কী আশা জেগে ওঠে। এবার নোবেল প্রাইজ ঠেকায় কে!

সেদিন সন্ধ্যায় ভবভূতি একা পায়চারি করছেন। মনে একটা নতুন ভাবনা গজিয়েছে। কুকুরগুলোকে রাষ্ট্রভাষা শেখালে কেমন হয়? অন্য ভাষার চাইতে ওটা খুব তাড়াতাড়ি শেখারই কথা। একটু রাগিয়ে দিয়ে শেখাতে শুরু করলেই ঝটপট শিখে নেবে। রাগ হলেই তো মুখ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে যায়।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সেই বেলতলায় গেছেন ভবভূতি। হঠাৎ মাথার ওপরে ডালপালার আড়াল থেকে কে ভারী গলায় বলে উঠল—ঘর্‌র্‌র্‌র্ ঘুঁ-উ!

চমকে উঠলেন ভবভূতি। কথাটার মানে—কী ভায়া? ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি।

অন্ধকারে ভবভূতি কাকেও দেখতে পেলেন না। বললেন—গঁঃ গঁঃ ঘেউ-উ। কে হে তুমি? গাছে কী করছ?

জবাব এল—ঘ্যাঁ-এঁ্যা-এঁ্যাক্ ঘর্‌র্‌র্‌র্...

কী? ভবভূতি খাপ্পা। বলছে কিনা, আমি যাই করি, তাতে তোমার কী হে! ভবভূতির বেলগাছে বসে ভবভূতিকেই চোখ রাঙাচ্ছে—তাও এই রাতবিরেতে? তিনি রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলেন—মানুষের ভাষাতেই। এবং রাগ হলে বাঙালি ভদ্রলোক যা করেন, তাই করলেন—অর্থাৎ গেট ডাউন। গেট ডাউন ইউ ব্লাডি ফুল!

অমনি ধপ করে তাঁর সামনে কে লাফিয়ে পড়ল। অন্ধকার গাঢ় হয়নি ততটা। আবছা দেখলেন, বেঁটেখাটো মোটাসোটা একটা লোক। খালি গা। পরনে খাটো ধুতি কোঁচা করে পরা। পায়ে যেন খড়মও আছে। গলায় পৈতেও ঝকমক করছে।

অবিকল সেই জ্যোৎস্নারাতে ব্রহ্মদৈত্যবেশী গজপতির মতো।

তাহলে আবার নির্ঘাৎ গজপতি রসিকতা করতে বেলগাছে চেপেছিলেন। এই ভেবে ভবভূতি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—গজু, তুই মাইরি আস্ত ভূত!

—ভূত! বেলগাছের লোকটা ঘুষি তুলে বসল। তুমি ভূত! তোমার চোদ্দপুরুষ ভূত! আর গজু বলছ, সেই গজু-টজুকে আমি চিনি না!

ভবভূতি বললেন—দেখ গজু, বাড়াবাড়ি কোনো না। গায়ে জল ঢেলে দেব বলছি!

—কেন? জল ঢালবে কেন?

—তোমার গায়ের কালো পেন্ট ধুয়ে যাবে সেদিনকার মতো।

—সেদিনকার মতো? কী বলছ! আমি আজ এক বছর কাশীগয়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সদ্য কাল সন্ধেবেলা ফিরেছি। ফিরেই তোমার কীর্তিকলাপ দেখছি।

ভবভূতি অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—তুমি গজু নও?

বেঁটে মূর্তিটি জোরে বনবন করে লাটিমের মতো টিকিসমেত ঘুরপাক খেয়ে বলল—না না না কভি নেহি!

—আলবাৎ গজপতি তুমি! চলো, আলোয় চলো! পরীক্ষা করে দেখব।

—আমার আলোয় যাওয়া বারণ আছে। যাব না। পরীক্ষা করে দেখতে হয়, এখানেই দেখ।

—ঠিক আছে। আগে এক বালতি জল আনি।

—সে কী! কেন, কেন?

—তোমার গায়ের কালো পেন্ট ধুতে হবে না? তখন তোমার ফর্সা রঙ বেরিয়ে পড়বে।

ভবভূতি পা বাড়াচ্ছিলেন, মূর্তিটি পিছু ডাকল। —শোন, শোন। বলছিলুম কী, জল না ঢাললে হয় না? বড্ড ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। মাইরি, শীতে জমে যাব। তুমি বরং কাছে এসে

আমাকে টিপে দেখ! আমি তোমার গজু না টজু, সহজে বুঝতে পারবে।

ভবভূতি সটান গিয়ে ওর গোঁফ খামচে ধরলেন। মূর্তিটি চ্যাঁচামেচি করে বলল—ওরে বাবা রে! গেছি রে! গেছি রে! ছাড়ো ছাড়ো! উঃ হু হু হু!!

তাই তো! গজপতির তো গোঁফ নেই। সে রাতে নকল গোঁফ পরেছিলেন। কিন্তু এর গোঁফটা দেখা যাচ্ছে আসল। তার চেয়ে বড় কথা, আজ সকালে গজপতি এসেছিলেন। গোঁফ পরিষ্কার কামানো ছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই এমন পেল্লায় গোঁফ গজাতে পারে না তাঁর। তাহলে এ গজপতি নয়, অন্য কেউ।

ভবভূতি গোঁফ ছেড়ে চুল ধরতে গেলেন। ধরা গেল না। ছোট ছোট চুল যেন পেরেকের ডগার মতো। হাতে বিঁধতেই ভবভূতি হাত সরিয়ে নিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন—তাহলে তুমি কে শুনি?

মূর্তিটিও তাঁর মতো গম্ভীর গলায় জবাব দিল—আমার নাম বলা বারণ। তাছাড়া বললেই তুমি ভিরমি খাবে। কাজেই চেপে যাও।

—ইয়ারকি? পুলিশে দেব তোমাকে। কেন তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছ?

—তোমার বাড়ি? তোমার বাড়িতে ঢুকলুম কোথায়? আমি তো গাছে ছিলুম।

—গাছটাও যে আমার।

—তোমার গাছ মানে? আজ তিনশো বছর এই গাছ আমার দখলে! আমি এই গাছে থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম! আর তুমি বলছ আমার গাছ?

—গাছে থাকো! এই বেলগাছে? রাগের মধ্যে ভবভূতি হেসে ফেললেন।

মূর্তিটি বলল—এতে হাসির কী আছে? যার যেখানে বাসা। তুমি মানুষ, তাই বাড়িতে থাকো। আমি ইয়ে, তাই বেলগাছে থাকি।

—ইয়ে মানে? তুমি কি ব্রহ্মদত্যি?

—খবরদার নাম ধরে বলবে না। জানো না কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বললে রেগে যায়? ব্রহ্মদত্যিকে ব্রহ্মদত্যি বললে রাগ হবে—ভীষণ রাগ…বলে সে দাঁত কিড়মিড় করে রাগটা দেখিয়ে দিল। টিকিটা কাঠির মত সোজা দাঁড়িয়ে রইল।

ভবভূতি এবার একটু সংশয়ান্বিত হয়ে বললেন—তাহলে বলছ, তুমিই এই বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি?

—আলবাৎ। আদি, আসল এবং অকৃত্রিম ব্রহ্মদত্যি। এতটুকু ভেজাল নেই।

—বিশ্বাস করি না। আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল।

—তাহলে প্রমাণ চাও?

—হুঁউ। চাই।

—বলো, কী প্রমাণ চাও?

—তুমি যদি আসল ব্রহ্মদত্যি, তাহলে…তাহলে……

কথায় বাধা পড়ল। গাড়িবারান্দা থেকে ডাঃ হাউরের গলা শোনা গেল—কার সঙ্গে কথা বলছেন ভবভূতিবাবু?

অমনি মূর্তিটি একলাফে গাছের ডালে উঠে পড়ল। ফিসফিস করে বলল—এই? ওকে বোলোনা মাইরি! ডাক্তার-টাক্তার দেখলেই আমার বড্ড বুক কাঁপে। ওরা যে ইনজেকশান দেয়!

ভবভূতি হাসি চেপে ডঃ হাউরকে বললেন—ও কিছু না। আপনি বরং কালীপদকে কড়া করে কফি বানাতে বলুন। ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ।

—তাহলে আর শিশিরে ঘুরবেন না।…বলে ডাঃ হাউর ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ভবভূতি বললেন—কই হে ব্রহ্মদত্যি মশাই, নেমে এস!

—ডাক্তার আর আসবে না তো?

—না, না। তুমি নেমে এস। উনি ডাক্তারও বটেন, ডক্টর-ও বটেন! কাজেই ভয় নেই।

ব্রহ্মদত্যি নেমে এল আবার। তারপর বলল—যাক্‌গে। যেজন্যে তোমায় দেখা দিয়েছি, বলি! এতক্ষণ খালি বাজে বকবক কথা হল। ভবভূতিভায়া, তোমায় বন্ধু বলেই মেনে নিয়েছি! তো কথাটা হচ্ছে—আমায় শ্বানভাষাটা শেখাবে?

—নিশ্চয় শেখাব। ইতিমধ্যে শুনে-শুনে তো তুমি কিছু শিখেই ফেলেছ।

—হুঁউ। ভেউ-উ-উ গ র্ র্ র্ র্।

—উঁহু। ভেউ-উ-উ-উ গঁর্ র্ র্ র্। জিভ তালুতে ঠেকিয়ে উচ্চারণ করো।

—ভেউ-উ-উ-উ গঁর্ র্ র্ র্ র্ র্ র্।....

পরদিন গজপতি এসেছেন বন্ধুসকাশে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়াটা ভালই হয়েছে। ভবভূতি ভাতঘুম দিচ্ছেন অভ্যাসমতো। ডাঃ হাউরের ও পাশের ঘর নাক ডাকছে। কালীপদর তো সব-সময় ঢুলুনি। সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে নেয়। সে শ্বান ভাষায় নাক ডাকছে—গঁ র্ র্ র্ র্ র্ গোঁ!

গজপতির দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। বেরিয়ে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়েছেন। সবে শীত পড়েছে। বেশ আরাম লাগে।

হঠাৎ কানে এল, বেলগাছ থেকে কে সুর ধরে আওড়াচ্ছে:

'গর্ র্ র্ মানে এস এস—
ভেউ মানে কে রে?
ঘেঁউ মানে খবর্দার—
যাব নাকি তেড়ে?
খ্যাঁক মানে কামড়াব
ভ্যাঁক্ মানে যাঃ।
আঁউ মানে পেটে ব্যথা—
কিছু খাব না...'

গজপতি পা টিপে টিপে এগোলেন! নিশ্চয়ই ভবভূতির কোন ছাত্র শ্বান ভাষায় পড়া মুখস্থ করছে। পরীক্ষার সময় ছাত্ররা

নিরিবিলিতে এমনি করেই তো মুখস্থ করে। গজপতি বেলতলায় গিয়ে মুখ তুলে দেখলেন, ঘনডাল ও পাতার আড়ালে কালো কুচকুচে একটি বেঁটেখাটো টিকিওয়ালা মূর্তি আপন মনে বসে পড়াশুনো করছে। গজপতি বললেন—কে হে তুমি? গাছের ডালে বসে ও কী মুখস্থ করছ?

মূর্তিটা পাতা সরিয়ে গজপতিকে দেখেই ফিক করে হাসল। তারপর হনুমানের মতো সড় সড় করে নেমে এসে বলল—গজু না তুমি? সেই অ্যাট্টুকুন দেখেছি—ওরে বাবা! কত বড়ো হয়েছ তুমি? কত বুড়ো হয়েছো! সেই যে তোমার দিদি রাতের বেলা জানলায় দাঁড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করত—আর তুমি বিছানায় শুয়ে টুক টুক করে তাকিয়ে দেখতে। সে কি আজকের কথা? এস গজু, তোমায় আদর করি। ওরে আমার গজু ছোনারে! তোমার চুল কেন পাকল? ওরে গজু রে খজু রে!....

গজপতি ততক্ষণে গেটের কাছে। গেট বন্ধ! তখন পাঁচিলে উঠে পড়লেন কোনরকমে। তারপর লাফ দিলেন। তারপর পড়ি-কী-মরি করে দৌড়! একদৌড়ে ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে। আর এ জীবনে ও বাড়িতে নয় বাপ্‌স!

ব্রহ্মদত্যি দুঃখিত মনে বেলগাছে উঠে আবার পড়ায় মন দিল।

গজপতি আর সত্যিই আসেন না ঘুঘুডাঙায় ভবভূতির 'সরমা' ভবনে। ভবভূতি, ডাঃ হাউর আর কালীপদ, আর সতেরটা কুকুর, আর বেলগাছের...ব্রহ্মদত্যিমশাই দিব্যি কাটাচ্ছে। কুকুরগুলো আজকাল মানুষের ভাষায় কথা বলতেও পারে নাকি! তোমরা কেউ ইচ্ছে করলেই ঘুঘুডাঙা হাজির হতে পারো। তবে সাবধান, ব্রহ্মদত্যি-মশায়ের জন্য সন্দেশ নিয়ে যেতে ভুলো না। নয় তো বেলগাছ থেকে শ্বানভাষায় গর্জন শুনবে—ঘেঁউ গঁর্‌ র্‌ র্‌ র্‌!...

www.boiRboi.blogspot.com

বকুলগাছের লোকটা

এ আমার ছেলেবেলার কাহিনী। ইচ্ছে হলে বিশ্বাস না করতেও পার কেউ! কিন্তু সত্যি ঘটেছিল।

এক শীতের সকালে পুবের বারান্দায় ঝলমলে রোদ্দুর খেলছে। আমি আর আমার বোন ইলু সতরঞ্জি পেতে বসে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছি। কদিন বাদেই বার্ষিক পরীক্ষা কি না! তার ওপর মেজকাকা বলে দিয়েছেন, যত জোরে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করবি, তত ভাল রেজাল্ট হবে। ইলু তো গলা ভেঙে ফেলল উৎসাহের চোটে। কিছুক্ষণ পরে শুনি, ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ আওয়াজ বেরুচ্ছে বেচারীর গলা থেকে। সে মাঝে মাঝে বই থেকে মুখ তুলে করুণ চোখে তাকিয়ে যেন মেজকাকাকেই খুঁজছে।

মেজকাকার পাত্তা নেই। আমি বললুম—ইলু, বরং জল খেয়ে আয়!

ইলু ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল—যদি মেজকাকু এসে পড়েন!

—তুই ঝটপট খেয়ে আয় গে না! আমি বলব মা ইলুকে ডেকেছেন।

এই শুনে ইলু জল খেতে গেল ভেতরে। আমি আবার চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করেছি, 'মোগল সম্রাট আকবর···মোগল সম্রাট আকবর····,' সেই সময় কোত্থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল—কী পড়া হচ্ছে খোকাবাবু?

আমাদের বাড়ির এদিকটায় বাগান। বাগানের ওপাশে ধান খেত। সবে পাকা ধান কেটে নিয়েছে চাষীরা। সেদিকে দূরে ঘন নীল কুয়াশা ভাসছে, যেন বুড়ো মাঠ আলোয়ান গায়ে দিয়ে এখন ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে আছে। বায়ান্দা থেকে কয়েক মিটার তফাতে আছে একটা ঝাঁকড়া বকুলগাছ। মনে হল, আওয়াজটা এসেছে ওই

গাছ থেকেই। তাই মুখ তুলে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। খুঁজছি কে কথা বলল।

হঠাৎ দেখি, বকুলগাছ থেকে হনুমানের মতো ধুপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ল একটা বেঁটে নাদুস-নুদুস গড়নের লোক। হাঁটু অব্দি পরা ধুতি, খালি গা, কুচকুচে কালো রঙ। বুকের ওপর দিয়ে একটা পৈতে ঝুলছে। তার মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, খোঁচাখোঁচা হয়ে আছে। টিকিতে ফুল গোঁজা। তার গোঁফগুলোও সেইরকম বিচ্ছিরি। হাতে একটা হুঁকোও আছে। পায়ে খড়ম আছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তো অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে আছি। নাকে ভুর ভুর করে তামাকের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ঠিক এমন সুগন্ধি তামাক খেতেন।

কিন্তু বকুলগাছে অমন হুঁকো খাওয়া বিদঘুটে চেহারার লোক থাকাটা যদি বা মেনে নেওয়া যায়, তার এভাবে পড়া-ডিস্টার্ব করতে আসাটা মোটেও উচিত হয়নি। মেজকাকা থাকলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন।

সে হুঁকোয় গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ করে টান দিতে দিতে আমার একটু তফাতে পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর হুঁকো নামিয়ে বাঁ হাতে ধরে রেখে বলল—কী? ওটা কী পড়া হচ্ছে?

গম্ভীর মুখে জবাব দিলুম—ইতিহাস।

এই শুনে সে খিকখিক করে হেসে উঠল।—ইতিহাস? সে আবার কেমন হাঁস খোকা? অ্যাঁ? ঢের ঢের হাঁসের নাম শুনেছি। ইতিহাস নামে কোনো হাঁসের কথা তো শুনিনি!

কী বোকা লোক রে বাবা! হাসি পেল। বললুম—না, না, হাঁস নয়। ইতিহাস।

লোকটা বলল—সেই তো বলছি গো! পাতিহাঁস, এলেহাঁস, বেলেহাঁস, জলহাঁস, রাজহাঁস, বুনোহাঁস—কত রকম হাঁস আছে।

সে সব ছেড়ে ওই উদ্ভুটে ইতিহাঁস নিয়ে পড়াটা সুবিধের নয়। বরং ওই যে কী বলে পাতাল হাঁস—নাকি হাঁসপাতাল—সেটাও মন্দ নয়!

এবার একটু রাগ হল। বললুম—তুমি কিস্যু বোঝো না!

—বুঝি না? আমি বুঝি না? লোকটাও চটে গিয়ে মুখখানা তুম্বো করে ফেলল!—আমি বুঝি না তো কে বোঝে শুনি? কোথায় থাকে তোমার ইতিহাঁস?

বইয়ের পাতা দেখিয়ে বললুম—এই তো এখানে থাকে।

সে আবার ফিক করে হাসল।—ওই শুকনো খসখসে বইয়ের পাতায় ইতিহাঁস থাকে? বলছ কী খোকা! খায় কী? এখানে তো দেখছি জলটল একফোঁটা নেই। সাঁতার কাটছেই বা কেমন করে?

বুঝলুম, বকুলগাছের এই হুঁকোখোর লোকটা একটি মুখ্যু। লেখাপড়াই জানে না। তাই ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য বললুম—ইতিহাঁস নয়, ইতিহাস। এর মানে কী জানো?

সে আপত্তি করে বলল—আমাকে মানে বোঝাতে এসো না! বিস্তর হাঁস দেখে-দেখে বুড়ো হয়ে গেলুম। দিনরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ডানা শনশন করে কত হাঁস আসছে-যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। কত-রকম গানও গায়, জানো? শোনো।

বলে সে হেঁড়ে গলায় গুনগুন করে গেয়ে উঠল:

'তেপান্তরের মধ্যিখানে
মস্তো একটা বিল আছে
কলমিদামে শালুক পানায়
কত যে ফুল ফুটতাছে
শামুক বুড়ো চিংড়ীবুড়ি
বড় সুখে রোদ পোহায়
যে যাবি ভাই আয় রে সাথে
শনশনিয়ে আয় রে আয়—'

গানটা কেমন ঘুমঘুম সুরে ভরা। শুনতে-শুনতে হাই ওঠে। ঢুলুনি চাপে। শীতের লম্বা রাতে বেজায় লম্বা ঘুমের পর এই মিঠে

রোদের সক্কালবেলা আবার ঘুমিয়ে পড়াটা বিপজ্জনক। মেজকাকা এসে টের পেলেই চুল খামচে ধরবেন।

গান শেষ করে লোকটা চোখ নাচিয়ে বলল—দারুণ গান, তাই না? বলে সে আবার গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ করে হুঁকো টানতে থাকল।

আমি ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে বললুম—গানটা ভাল লাগল। তবে বড্ড ঘুম পায় যে। ওগো লোকটা, তুমি বরং রাতে শোবার সময় এস। এখন যাও। পড়ায় ডিসটার্ব কোরো না। মেজকাকা বকবেন।

—কে তোমার মেজকাকা? ঢ্যাঙা রোগামতো ছোকরাটা বুঝি?

—চুপ! ও কথা বোলো না। মেজকাকাকে রোগা বললে আগুন হয়ে ওঠেন। মেজকাকার একটা কুকুর আছে, জানো তো? তার নাম কালু। কালুকে—

এ পর্যন্ত শুনেই লোকটা যেন চমকে উঠল। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল—কালু এখন বাড়িতে আছে নাকি?

বললুম—মনে হচ্ছে না। থাকলে এতক্ষণ তোমাকে—

ওরে বাবা! বোলো না, বোলো না!

ওকে ভয় পেতে দেখে খুব মজা লাগল। বললুম—তাই তো বলছি, পড়ায় ডিসটার্ব না করে তুমি কেটে পড়ো। এক্ষুণি কালু এসে পড়তে পারে। বোধহয় মেজকাকার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে।

লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল—তাহলে আসি। আমার কথা কাকেও বোলা না যেন। পরে সময়মতো এসে তোমাকে আরও হাঁসের গান শোনাব। ইচ্ছে করলে দেখতে যেতেও পারো হাঁসেরা কোথায় থাকে। কিন্তু তাই বলে সেখানে তোমার ওই ইতিহাঁস দেখতে পাবে ভেবো না। তোমার পড়ার বইতে মিথ্যে লিখেছে! বরং ওই যে কী বলে পাতালহাঁস বা হাঁসপাতাল সত্যি হলেও হতে পারে।

এই বলে সে খড়ম পায়ে চাপা খটখট শব্দ তুলে বকুলগাছে দিব্যি চড়ে গেল এবং ঝাঁকড়া ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হল। আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম। আমাদের বাগানের বকুলগাছটাতে এমন কেউ থাকে তা তো শুনিনি। বাবা মা মেজকাকা সেজকাকা ছোটকাকা কেউই বলেননি ?

ইলু এতক্ষণে এসে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল—কী রে বিশু ? কী দেখছিস অমন করে ? সেই লেজঝোলা পাখিটা ?

উঁহু, বকুলগাছের লোকটা পই পই করে বারণ করেছে। কাকেও ওর কথা বলব না।

—কী রে বিলু ? বলছিস না যে! বারবার জিগ্যেস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে না বুঝি ?

ইলুকে পাত্তা না দিয়ে আবার পড়া শুরু করলুম : মোগলসম্রাট আকবর মোগলসম্রাট আকবর—ইতিহাস না—পাতিহাঁস এলেহাঁস বেলেহাঁস, রাজহাঁস পুষতে ভালবাসতেন। তাই তিনি—

ইলু অবাক হয়ে বলল—কী পড়ছিস রে। দাঁড়া মেজকাকা আসুক--

বকুলগাছের লোকটার কথা আমি কাকেও বলিনি। সেই যে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল, তারপর কতবার এই বারান্দা কিংবা বাগানে একলা হলেই সে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কতরকম মজার মজার গল্প শুনিয়েছে। কত আজব ছড়া!

কিন্তু মুশকিল বাধাচ্ছিল মেজকাকার কুকুর কালু। বেশ দুজনে কথা বলছি, হঠাৎ কালুটা কোথায় ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, অমনি লোকটা বকুলগাছে লুকিয়ে পড়ে। কালুটা মহা পাজী। গাছটা চক্কর দিয়ে ওপরে মুখ তুলে কতক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে। আমি ওকে তাড়াতে গেলে দাঁত বের করে আমাকেই কামড়াতে আসে। আমি ঢিল ছুঁড়ে তাড়াই।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে বাগানে একলা দাঁড়িয়ে ওর একটা গল্প শুনছি। গল্পটা দারুণ মজার। আমাদের গাঁয়েরই এক শাকতোলানী বুড়ি গেছে তেপান্তরের মাঠের মধ্যিখানে

সেই হাঁসচরা বিলে। বুড়িটা ছিল বড্ড কুঁদুলী। লোকে বলত পাহাড়কুঁদুলী। কারণ পাড়ার লোকের সঙ্গে হুট করতেই কোঁদল জুড়ে দিত।

সেই পাড়াকুঁদুলী বুড়ি আপন মনে হাঁসচরা বিলে কলমী শাক তুলছে। তার স্বভাব যাবে কোথায়? একটা শামুকের শুঁড়ে ওর ঠ্যাঙে সুড়সুড়ি লেগেছে বলে বুড়ি তার সঙ্গে কোঁদল জুড়ে দিয়েছে।

বুড়ি নেচেনেচে ছড়া গেয়ে কোঁদল করছে:

'তোর মুণ্ডু খাই, তোর কত্তাবাবার খাই।
কড়মড়িয়ে খাই আমি মড়মড়িয়ে খাই।
খেয়েদেয়ে ড্যাঙ্গডেঙ্গিয়ে নাতির বাড়ি যাই—'

এদিকে হয়েছে কী, জলার ধারে থাকে এক শাঁখচুন্নী। সেও পেত্নীপাড়ার নামকরা কুঁদুলী। শাঁখ, গুগলি, কাঁদড়া আর শামুক তার খাদ্য। এ বুড়ি যেমন পেটের জ্বালায় শাক তুলতে গেছে সেই শাঁখচুন্নীও তেমনি পেটের জ্বালায় গুগলি, শামুক খুঁজতে গেছে। শাকতোলানীর গলা পেয়ে সে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে সেখানে হাজির হয়েছে। হয়ে বলেছে—কীঁ কীঁ কীঁ?

ব্যস! দুই কুঁদুলীতে বেধে গেছে তুমুল কোঁদল। কেউ থামবার নয়। পরস্পর আঙুল তুলে পরস্পরকে শাসাচ্ছে। সে কী চিলচ্যাঁচানি! সে কী নাচনকোদন!

হেন সময়ে জলার হাঁসদের রাজার কানে গেছে সেই খবর। হাঁসের রাজা রাজহাঁস খাপ্পা হয়ে বলল:

'প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁকোর প্যাঁক্—
শিগগির গে' ছাখ তো
কারা দেখায় জাঁক রে
কাট তাদের নাক
তবু না থামে যদি,
কাটিস চুল আর দুকানের লতি
প্যাঁক প্যাঁকোর প্যাঁক
শিগগির ছাখ তো॥...'

হুকুম পেয়েই জলার যত পাতিহাঁস বেলেহাঁস শনশনিয়ে ডানা কাঁপিয়ে ঝাঁকেঝাঁকে আসতে লেগেছে। আকাশ বাতাসে হুলুস্থুল। জলার জল ঢেউয়ে তোলপাড়। তারপর কিনা···

আচমকা ঘেউ ঘেউ! ঘেউ ঘেউ! বাড়ির ভেতর থেকে হতচ্ছাড়া কালুটা বেরিয়ে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল এবং তাকে দেখেই আমার বকুলগাছের হুঁকোখেকো বন্ধুবেচারা এক লাফে গাছে চড়ে অদৃশ্য হল। তার হুঁকোটা পড়ে গেল হাত ফসকে। কলকে উল্টে ছাই পড়ল গড়িয়ে। আগুনের ফুলকি উঠল চিড়বিড়িয়ে। বগবগ করে একটু জলও হুঁকোর খোলের ফুটো থেকে গড়িয়ে পড়ল।

কালু চেঁচামেচি করে গাছ চক্কর দিচ্ছে। এমন সময় মেজকাকা বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। এসেই কালুকে ধমক দিয়ে বললেন—শাট আপ! শাট আপ!

কালু থামবার পাত্র নয়। সে মেজকাকুর কাছে এসে হাঁটুর কাছে মুখ তুলে কেঁউমেঁউ করে কী বলল। তারপর আবার দৌড়ে গেল গাছতলায়।

এবার মেজকাকা সন্দেহাকুল চোখে গাছটা দেখতে দেখতে বললেন—গাছে হনুমান আছে নাকি রে বিলু?

বললুম—না মেজকাকু। কালু একটা কাঠবেড়ালি দেখেছে।

হঠাৎ গাছতলায় উল্টে পড়ে থাকা হুঁকোটার দিকে চোখ গেল মেজকাকার। হুঁকোটা তুলে নিয়ে অবাক হয়ে বললেন—এ কার হুঁকো রে বিলু?

আমি তো জানিনে মেজকাকু।

মেজকাকা ধমক দিয়ে বললেন—জানো না? এখনও কলকের আগুন রয়েছে। কে হুঁকো খাচ্ছিল বল্ হতভাগা?

—জানিনে মেজকাকু।

—আলবৎ জানিস!—বলে হুঁকোটা তুলে ভুড়ুক ভুড়ুক করে কয়েকটা টান মেরে মেজকাকা ফুরফুর করে ধোঁয়া উড়িয়ে দিলেন। বাঃ। এ তো ভারি সুগন্ধি তামাক!

—ও মেজকাকু! ছ্যা ছ্যা! তুমি হুঁকো খাচ্ছ? বলে দেব বাবাকে?

মেজকাকা চোখ টিপে বললেন—চুপ। লেবেনচুষ দেব। তারপর মনের আনন্দে হুঁকো খেতে থাকলেন। ততক্ষণে কালু মেজকাকার কাছে ফিরে এসে মুখ তুলে যেন তামাকের গন্ধ শুঁকছে। কালুর মুখটা বেজায় গম্ভীর। চোখে সন্দেহের চাউনি।

তারপর কালু আমার কাছে এসে বেজায় ধমক দিল বার তিনেক। আমি অবিকল মেজকাকার গলায় বললুম—শাট আপ কালু! শাট আপ্।

কালু যেন কুকুরের ভাষায় পাল্টা ধমক দিয়ে বলল—চালাকি কোরো না বিলু। সব বুঝতে পেরেছি আমি। তারপর সে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে লেজ তুলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

মেজকাকা তারিয়ে তারিয়ে হুঁকো খাওয়ার পর চাপাস্বরে বললেন —এই বিলু, আরো দুটো লেবেনচুষ দেব। বল্ না, কার হুঁকো এটা?

বলব, না বলব না ভাবছি—হঠাৎ বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে গেল। ততক্ষণে শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। বাগানে আর একটুও দিনের আলো নেই। আবছায়া ঘনিয়েছে। গাছগুলো গায়ে কুয়াশার চাদর টেনে নিয়েছে। সেই ধূসর কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারে বকুলগাছটা থেকে একটা মস্তো লম্বা কালো হাত বেরিয়ে খপ্ করে মেজকাকার হাত থেকে হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

অমনি মেজকাকা আঁতকে উঠে গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

আর আমিও এতদিন পরে এতক্ষণে ঝটপট বুঝে নিয়েছি, বকুল-গাছের বন্ধুটি খুব সহজ লোক নয়। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছি সঙ্গে সঙ্গে।

আমার চেঁচামেচিতে বাবা বেরিয়ে এলেন। মা এলেন। আর সব কাকারা এলেন। সে এক হুলুস্থুলুস ব্যাপার। আলো আন! জল আন! পাখা আন!

পরদিন সকালে বুধু ওঝাকে ডেকে আনা হল। সে নাকি ভূত-প্রেতের যম। লোকে বলে বুধু ওস্তাদ। সে মেজকাকাকে খুব ঝাঁড়ফুঁক করে বলল—বলুন, নেই।

মেজকাকা মিনমিনে স্বরে বললে—নেই।

তারপর বুধু গাছটার চারপাশে ঘুরে দেখে-শুনে বাবাকে বলল—বড়বাবু! এই গাছটা আজই কেটে ফেলুন। এ গাছে ব্রহ্মদত্যি আছে।

বাবা ভয় পেয়ে বললেন—বলো কী হে ওস্তাদ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু। বলে বুধু আমার দিকে যেন চোখে তাকিয়ে ফের বলল—আমার মনে হচ্ছে, খোকাবাবুর দিকেও নজর পড়েছে ওনার। কেমন যেন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে! হুঁ—খোকা-বাবুর চোখে ব্রহ্মদত্যিমশাইকে দেখতে পাচ্ছি। ওই তো হুঁকো টানছে গুড়ুক গুড়ুক করে।

মা সভয়ে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোকা কিছুদিন থেকে ভাল করে খাচ্ছেটাচ্ছে না। খালি বকুলতলায় মন পড়ে থাকে। কী যেন ভাবে আর বিড়বিড় করে কথা বলে।

আমি বললুম—ভ্যাট্। আমার কিস্যু হয়নি।

বুধু আমার বুকে তার কড়ে আঙুল ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ল। তারপর ঘুরে বকুলগাছটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ধমক দিল—যা, যা! ভাগ!—

সেদিন দুপুরে দেখি, মকবুল কাঠুরেকে ডেকে আনা হয়েছে। সে কুড়ুল নিয়ে গাছটার কাছে যেতেই আমি কান্নাকাটি জুড়ে দিলুম। মেজ কাকা আমাকে থাপ্পড় তুলে ধমক দিলেন—শাট আপ! শাট আপ!

আমার চোখের সামনে নিষ্ঠুর মকবুল কাঠুরে গাছটার গোড়ায় কোপ মারতে শুরু করল। দুঃখে রাগে আমি অস্থির। কিছুক্ষণের মধ্যেই অত সুন্দর বকুলগাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। মকবুল দাঁত বের করে হেসে বলল—এবারে শীতের রোদ্দুর অনেকটা পাবেন বাবুমশাই। এখানে ফুলের গাছ লাগাবেন। দেখবেন, কেমন রাঙারাঙা ফুল ফুটবে।

www.boiRboi.blogspot.com

শূলপাণি ও গদাধর

এক যে আছে নদী। নদী, নাকি নদীর বাচ্চা। এখনও কুলুকুলুবু লিই শেখেনি। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে বয়ে যায়। টলতে টলতে এই পড়ি ওই পড়ি করে মাটি আঁকড়ে গাছগাছালির শেকড়-বাকড় খামচে বাঁকে বাঁকে টাল সামলে বয়ে যায়। কোথায় যায়?

সে খবর জানত বিরাং পাটনী। এখন সে ঘাটে নেই। পালিয়েছে। বেচারার বরাত। মাঝে মাঝে তাকে ঘাট ছেড়ে পালিয়ে থাকতে হয়।

আর ওই ভগলু ধোপা—যে সকাল সন্ধে নদীর ঘাটে কাপড় কাচে। সেও পালিয়েছে। মাঝে মাঝে তাকেও পালাতে হয়।

কেন পালাতে হয় ওদের, সেই নিয়েই এই গল্প।

এই বাচ্চানদীর একপাড়ে থাকেন শূলপাণি, অন্যপাড়ে গদাধর। দুজনে যখন ভাব থাকে, তখন ভয়ের কিছু নেই। বিরাং পাটনী কাঁই রে মাই রে করে গান গেয়ে নৌকো চালায়! ভগলু ধোপাও তাইরে নাইরে গাইতে গাইতে কাঠের পাটায় কাপড় কাচে।

কিন্তু শূলপাণি-গদাধরে বিবাদ লাগলেই অবস্থা ঘোরালো হয়। এখন সেই বিবাদ চলছে। তাই ঘাট ফাঁকা। শঙ্খচিলের বুড়ি মা, যে রোজ দুপুরে এখানে সুর ধরে কাঁদতে আসত, সেও আসতে পারেনি।

অথচ কিছুদিন আগেও কী ভাব ছিল গদাধর-শূলপাণির। নদীর দুপাড়ে দুজনে দাঁড়িয়ে এইসব কথাবার্তা হয়।

—এই যে! শূলপাণি মুচকি হেসে বলতেন।

—এই যে! গদাধরও ফিকফিক হেসে বলতেন।

হুঁ, হুঁ…খুব যে ইয়ে। অ্যাঁ? শূলপাণি চোখ নাচিয়ে বলতো।

এবার গদাধর একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলতেন—তা যাই বলো, তোমার ওই ইয়েটা কেমন যেন একটু ইয়ে।

শূলপাণি গতিক বুঝে বলতেন—না না। মানে তোমার শরীরটা বেশ নাদুসনুদুস হয়েছে। রঙটাও চেকনাই হয়েছে। খাচ্ছটা কি শুনি?

গদাধরের এবার হুঁ হুঁ করার পালা। সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলতেন—খাচ্ছি কী? বাঘের দুধ। খাঁটি সোঁদরবনের বাঘ। বুঝলে তো? তুমিও খেও। আমার মতো পালোয়ান হয়ে উঠবে। স্বাদও তোফা। অবিকল কোকাকোলার মতো। বরং এককুচি এলাচ মিশিয়ে নিও।

শূলপাণি আঁতকে উঠে বলতেন—ওরে বাবা! ডোরাডোরা দাগওয়ালা জিনিসকে আমার বড্ড ভয় করে যে! নৈলে বাঘের দুধ খেতে আমি পিছপা নই। কোকাকোলার মতো স্বাদ বলছ যখন।

গদাধর বলতেন—বলো তো, হটুরু গয়লাকে পাঠিয়ে দেব। চোখের সামনে দুধ দুয়ে দেবে।

—না ভাই, না। বরং হটুরুকে বলে দিও, রোজ এক গেলাস করে দিয়ে যাবে।

শোনা যায়, গদাধর শূলপাণির জন্যে হটুরুকে দিয়ে বাঘের দুধের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শূলপাণি সে-দুধ খেয়েছিলেনও; কিন্তু গায়ে একরত্তি মাংস লাগেনি। উল্টে পেটের গণ্ডগোল হয়েছিল।

তবে গ্রীষ্মকাল এলে গদাধরের এক জ্বালা। মোটা মানুষ। গরমে আইঢাই অবস্থা। নদীর ধারে গিয়ে শূলপাণির সঙ্গে দেখা হলে বলতেন—ও শূলো! এখন বুঝেছি, রোগা হওয়ার কত সুবিধে। বলে দাও না ভাই, কী খেয়ে এমন রোগা হয়ে আছ?

শূলপাণি বলতেন—কিছু না। স্রেফ চামচিকের রোস্ট। রোজ সকালে খালিপেটে একটা।

—কিন্তু এপাড়ে যে চামচিকেই নেই। খালি বাদুড়।

—ভেবো না। আমার ঘরে অসংখ্য চামচিকে। রোজ একটা করে পাঠিয়ে দেব।

চামচিকের রোস্ট খেয়েও নাকি গদাধর রোগা হতে পারেননি। মাঝখান থেকে গায়ের রঙটা বেজায় কালো হয়ে গিয়েছিল। এইতে গদাধর মনে মনে চটে শোধ নেবার ফিকিরে ছিলেন। শীতকালে শূলপাণি একদিন নিজের শীতকাতুরে দশার কথা তুললে গদাধর তাঁকে হাতির মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেন। শূলপাণি সাহস পাননি একে তো পেটের রুগী, সবসময় হজমিগুলি চোষেন।

নদীর দুপাড়ের এই দুই বন্ধুর মধ্যে ছোটখাটো রাগারাগি না দেখা গেছে, এমন নয়। তাতে বন্ধুত্ব চটেনি। এমনকি গত বর্ষার সময় প্রায় একটা সংঘর্ষ বাধতে বসেছিল। তাও শেষ অব্দি মিটে যায়।

হয়েছিল কী, নদীতে বর্ষার ঢল বইছে, আর ভেসে যাচ্ছে ফুলবাবুর মতো একটা মড়া। দুই বন্ধু দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। তো সেই ফুলবাবু মড়াটা ছিল বড্ড ফাজিল। হঠাৎ মাথা তুলে ফিক করে হাসল। তারপর যেমন ভাসছিল, তেমনি ভাসতে ভাসতে চলল। শূলপাণি বললেন—ও গদাই, ব্যাটা হেসে গেল কেন বলো তো?

গদাধর বললেন—তাই তো হে শূলো। হাসল কেন বলো তো?

শূলপাণি মিটিমিটি হেসে বললেন—বুঝেছি। তোমাকে দেখে ওর হাসি পেয়েছিল।

—কেন, কেন? গদাধর চোখ কটমট করে তাকালেন।

শূলপাণি বলেই ফেললেন—তুমি যে হোঁদল কুতকুত! দেখলে কার না হাসি পায়! আমারই তো পাচ্ছে। হি হি হি হি…

—হা হা হা হা। গদাধর ভেংচি কাটলেন।

ভগলু ধোপা কাপড় কাচছিল। শূলপাণি আর গদাধর দুই

পাড়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ভেংচি কাটছেন দেখে সে ভয় পেয়ে বলে উঠল—ও বাবুমশাইরা! তার চে' মড়াটার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলেই তো হয়।

কথাটা মনে ধরল। তখন দুজনে দুই পাড় ধরে দৌড়ুলেন। ততক্ষণে মড়াটা বাঁকঅব্দি এগিয়ে একটা কচুরিপানার দামে ঢু মারছে। দুই বন্ধু সামনাসামনি গিয়ে দুই পাড় থেকে এক গলায় চেঁচিয়ে ডাকলেন—ও দাদা! শোন, শোন।

কচুরিপানা নিয়ে ব্যস্ত মড়া তেতোমুখে বলল—কী, কী, কী?

—কাকে দেখে তখন হেসে এলে বলে যাও না দাদা?

—বলব কেন? লেবুনচুষ দাও।

শূলপাণির পকেটে তো হজমিগুলি সবসময় থাকে। টুপ করে ছুড়ে দিলেন। মড়াটাও খপ করে লুফে নিয়ে গালে পুরল। গদাধর তখন মিছিমিছি পকেট হাতড়াচ্ছেন। তো মিঠে ঝাঁঝালো হজমিগুলি চুষতে চুষতে শ্রীমান মড়া গদাধরের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে বলল—

মানুষ না টানুষ না
ভূত না মাহুত না
ওটা একটা হাতি
পাঁকে পড়লেই খায়
চামচিকের লাথি॥—

শুনে শূলপাণির সে কী তিড়িংবিড়িং নাচ। হি হি হি গদাই—হি হি হি! গদাধর রেগে কাঁই। ঢিল কুড়োন আর ছোড়েন। ভাসমান ৺ফুলবাবু ততক্ষণে বাঁক পেরিয়ে উধাও। তখন গদাধর আঙুল তুলে শূলপাণিকে শাসাতে শাসাতে বাড়ি চললেন।

পরদিন লোকেরা দেখল, গদাধর একটা প্রকাণ্ড গদা কাঁধে নিয়ে নদীর পাড়ে এসে গর্জাচ্ছেন—কই শূলো, কোথায় শূলো? তারপর খবর পেয়ে শূলপাণিও এলেন, হাতে মস্তো শূল। মুখে বিকট হুঙ্কার। গদাধর করছেন দাঁত কড়মড়। বাচ্চা নদী ভয়ে চুপ। আকাশে

মেঘমেঘালি চোখ বুজেছে। বাতাস বইছে না। গাছগাছালির ঠোঁটে আঙুল। পাখপাখালি ডাকছে না। শূলপাণি শূল নেড়ে হাঁকেন —চলে আয়, দেখাচ্ছি মজা। গদাধর গদা ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে ডাকেন—চলে আয়, দেখাচ্ছি মজা।

তারপর রাগের চোটে শূলপাণি ছোড়েন শূল, গদাধর গদা। আর, কোত্থেকে একটা চিল এসে ছোঁ মেরে শূল নিয়ে পালায়। কোত্থেকে কোলাব্যাঙ এসে গদা নিয়ে ভুস করে ডুব মারে। চিল আর একটা কোলাব্যাঙের স্বভাবই এই। ক্ষীর নদীর কূলে মাছ ধরতে গিয়ে খোকনের হয়েছিল একই অবস্থা।

তো অস্ত্র নেই। যুদ্ধটা হবে কিসে? তার চেয়ে বড় কথা, যুদ্ধশাস্ত্রে আছে: 'কদাপি নিরস্ত্রকে বধ করিবে না। মহা পাপ হয়।' তাই ভেবে চিন্তে গদাধর বললেন—আয় রে শূলো, সন্ধি করি। শূলপাণিও অগত্যা বললেন—তাই হোক। সন্ধি।

এই সন্ধির ফলে দুই পাড়ের লোকেরা পেটপুরে ভোজ খেতে পেয়েছিল। সে কী ভোজ! ভগলু ধোপা দূরের গাঁয়ে জামাইবাড়ি গিয়ে গল্প করছিল—একশো আটান্নরকম ব্যাঙের মুড়িঘণ্ট, টিকটিকির ডিমের ডালনা, তেঁতুলের আরকে মাখানো তরমুজভাজা আর সরষেবাটা দিয়ে গুগলির চোখ। আর শূলোবাবু বস্তাবস্তা হজমিগুলিও বিলিয়েছিলেন। তাতে নাড়ু ডাক্তার খাপ্পা। একদিনেই কত রুগী পাওয়া যেত। সব হাতছাড়া হয়ে গেল কি না।— —

এবার বলি এই সেদিন যে বিবাদটা হয়েছে, তার কথা। এ বিবাদ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। এত সাংঘাতিক যে আর কখনও দুজনের ভাব হবে বলে মনেই হয় না। তবে এই প্রচণ্ড ব্যাপারটার পিছনে যেটুকু আছে, না বললে কিস্যু বোঝা যাবে না।

গত বর্ষায় হল কী, এক সন্ধেবেলা উরুলিঝুরুলি বৃষ্টি পড়ছে। শূলপাণি উদাস হয়ে বসে আছেন ঘরে। নদীর ধারে যাওয়া হল না। গদাধরের সঙ্গে কথাবার্তা হল না। মন খারাপ। এমন সময় হঠাৎ শূলপাণির কানে এল কুঁই কুঁই শব্দ। বাড়ির পিছন থেকে

শব্দটা আসছে। ওদিকটায় একসময় আস্তাবল ছিল। এখন ভাঙ্গাচোরা দশা। তো ছাতি মাথায় শূলপাণি সেখানে গিয়ে দেখেন কী, চারঠ্যাংওয়ালা এট্টুকুন একটা প্রাণী কুঁইকুঁই করে কাঁদছে। এটা যখন আস্তাবল, তখন প্রাণীটা ঘোড়ার বাচ্চা ছাড়া আর কী হতে পারে। দয়ালু শূলপাণি ওটাকে নিয়ে এলেন। আহা, কতকাল আর ঘোড়ায় চাপা হয় না। পুষে ফেলে একে বড় করতে পারলে কাজে লাগবে।

কিছুদিন পরে এসেছে হটুরু গয়লা দুধ দিতে। বাবুমশাই চারঠেঙা-টাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন দেখে সে ভাবল, বাবুমশায়ের আদরের জিনিসটার একটু প্রশংসা করা উচিত। সে বলল—বাবু-মশাই, আপনার কোলে যেন সুয্যি উঠেছে গো! আহা হা, দেখলে চক্ষু জুড়োয়।

শূলপাণি সগর্বে বললেন—দেখছিস কী হটুরু! এ আমার পক্ষিরাজের বাচ্চায়ে!

হটুরু হেঁট হয়ে আঙুল তুলে বলল—তাই বটে! ওই দুটো বুঝি ডানা বাবুমশাই?

—অ্যাঁ। শূলপাণি ধাঁধায় পড়ে গেলেন। মাথার দুপাশে এই যে দুটো চ্যাপ্টা লম্বা পাতলা জিনিসকে কান ভেবেছিলেন। শূলপাণি বললেন—তাই মনে হচ্ছে নাকি হটুরু?

—হুঁউ। ডানাই হবে—বলে ধূর্ত হটুরু কেটে পড়ল। সেদিন দুধে দিয়েছে অঢেল জল। তাই শূলপাণিকে খুশি করতে চেয়েছিল।

কিন্তু শূলপাণির এই স্বভাব। যা মাথায় ঢুকবে, সহজে বেরুবে না। রোজ প্রাণীটার মাথার দুপাশে ওই চ্যাপ্টা পাতলা জিনিস দুটোকে সর্ষের তেল দিয়ে ডলাইমলাই করেন। শিগগির-শিগগির বাড়ুক। শূলপাণি তবে না রাজপুত্তুরটি হয়ে কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে তেপান্তরমুখো উড়বেন।

শূলপাণির চাকর বেচুরাম একদিন আর থাকতে পারল না। বলল —কর্তামশাই, ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে?

শূলপাণি একগাল হেসে অভয় দিলেন।—নির্ভয়ে বল্ বাবা বেচু।

—কর্তামশাই, এটা মনে হচ্ছে নেড়ি কুকুর।

—কী বললি, কী বললি ?

—আজ্ঞে, ঘোড়া হলে তো চিঁহি করত।

তাও তো বটে। শূলপাণি একটু ভেবে বললেন—হুঁ, শেখানো হয়নি, তাই চিঁহি করছে না। ঠিক আছে। তুই আমাদের পণ্ডিত-মশাইকে ডেকে আন্ এক্ষুণি।

খবর পেয়ে পণ্ডিতমশাই এলেন। চোখে ভাল দেখেন না। নাকের ডগায় চশমা পিছলে যায়। সুতো দিয়ে টেনে রাখেন। দেখে শুনে বললেন—উঁহু, চিঁহি বলে কোন ভাষা নেই। তবে হ্রেষা নামে ভাষা আছে, তারই ব্যাকরণের নাম চিঁহিকরণ। বাবা শূলো, তোমার এই পক্ষিরাজশাবকের হ্রেষাশিক্ষার ভার আমি নিলুম। ভেবো না, কত গাধা ঠেঙিয়ে ঘোড়া করলুম। আর এতো ঘোড়া হয়েই আছে। কিন্তু ওর একটা নাম চাই যে! ছাত্রদের হাজিরা খাতায় লিখতে হবে তো!

…বলে পণ্ডিতমশাই প্রাণীটাকে চারপাশে ঘুরে-ঘুরে দেখে নিয়ে বললেন—ওর কান দুটো দেখছি বেজায় লম্বা। তাই নাম দিলুম লম্বকর্ণ।

শূলপাণি বলতে যাচ্ছিলেন, ওদুটো কান নয়—ডানা, বলার সুযোগ পেলেন না। পণ্ডিতমশাই আদরের পড়ুয়াটিকে বগলদাবা করে প্রায় দৌড়ুচ্ছেন। পাঠশালায় ঘুঘু চরছিল। যাক্ গে, একটা ছাত্র তো পাওয়া গেছে।

ওদিকে নদীর ওপাড়ে গদাধর এসব খবর পেয়েছেন। পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। শূলো তাঁকে টেক্কা দেবে যে! এপাড়ের লোকের কাছে মাথা হেঁট হয়ে যাবে না বুঝি? তাই ঠিক করলেন, শূলপাণি যখন পক্ষিরাজের বাচ্চা পুষেছেন, তখন তিনি পুষবেন হাতির বাচ্চা। কিন্তু পক্ষিরাজ তো ওড়ে, হাতি কি ওড়ে? গদাধর একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন।

তো ওপাড়ে পণ্ডিত মশাই আছেন, আর এপাড়ে বুঝি নেই? এপাড়ওয়ালারা কি এত মূর্খ? এপাড়ের পণ্ডিতের কাছে গিয়ে গদাধর জিগ্যেস করলেন—বলুন তো পণ্ডিতমশাই, হাতি কি ওড়ে?

পণ্ডিতমশাই বললেন—কে বলেছে ওড়ে না? ঐরাবত নিশ্চয় ঘোড়া ছিল না, নির্ভেজাল হাতি। দেবরাজ ইন্দ্র তার পিঠে চেপে স্বর্গ থেকে মর্ত ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতেন। নেহাত কুচুটে শনির কোপে গণেশের মুণ্ডু গেল, আর ঐরাবতের মুণ্ডু কেটে গণেশকে বাঁচাতে হল, তাই ইন্দ্র পুষ্পকরথের অর্ডার দিয়েছিলেন।

এরপর গদাধর হাতির বাচ্চা খোঁজেন। পেয়েও যান। একেবারে নাকের ডগায়, তাঁরই বাড়ির ছাইগাদায়। কালো কুচকুচে, নাদুস-নুদুস, হোঁদল কুতকুতে প্রাণী। ভোঁস ভোঁস করে খালি ঘুমোয়।

খবর পেয়ে এপারের পণ্ডিতমশাই এলেন। এক গাল হেসে বললেন—ছাত্র হিসেবে ভারি শান্ত মনে হচ্ছে। খুব ঘুমোয় দেখছি। ঠিক আছে। ওর নাম দিলুম কুম্ভকর্ণ। ওকে আমি বৃংহতি ভাষা শেখাব। দেখবে, অ্যায়সা বৃংহতিনাদ ছাড়বে যে ওপারের শূলোবাবাজীর পক্ষিরাজ মাঝপথে হার্টফেল করে মারা পড়বে। তদুপরি পাণিনির মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অধ্যায় মুখস্থ করাতে পারলে তো একেবারে দ্রিদিম করে পক্ষিরাজের আমতারা ফাঁচকলিয়ে দেবে। হেঃ হেঃ হেঃ।

গদাধরও আনন্দে হাসলেন—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

যথাসময়ে দুইপাড়ে দুই প্রাণীবিশেষ, অর্থাৎ লম্বকর্ণ ও কুম্ভকর্ণের শিক্ষাদীক্ষা শেষ হল। তারপর শূলপাণি তাঁর লম্বকর্ণকে নিয়ে নদীর ধারে এলেন। গদাধরকে তাক লাগিয়ে দেবেন। গদাধরও তাঁর কুম্ভকর্ণকে নিয়ে হাজির হলেন। শুলপাণির চক্ষু চড়কগাছ করে ছাড়বেন!

দুই পাড়ে দুই গাঁয়ের লোকেরাও এসে ভিড় জমাল। পণ্ডিত-মশাইরাও নিজ-নিজ এলাকায় দাঁড়িয়ে আপন-আপন পড়ুয়ার দিকে সগর্বে তাকাচ্ছেন, আর উৎসাহ দিচ্ছেন।

হঠাৎ অঘটন ঘটল।

লম্বকর্ণ নদীর ওপাড়ে কুম্ভকর্ণকে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠল—ভেক্ ভেক্ ভেউ-উ-উ।

কুম্ভকর্ণ জবাব দিল—ঘেক্ ঘেক্ ঘেউ-উ-উ।

হায় হায়, কোথায় হ্রেষা কোথায় বৃংহতি! এযে একেবারে দেহাতী বুলি—তুই কে রে?…তুই বা কোন্ ব্যাটা রে? মধ্যিখানে বাচ্চানদী কুলুকুলু হেসে সারা। শেষ অব্দি হাতিঘোড়া গেল তল, কুকুর বলে কত জল। কুকুরকেত্তন আর বলে কাকে? দুই পাড়ের লোকেরাও আর চুপ করে থাকতে পারল না। পেট চেপে ধরে হা হা হা হো হো হি হি

হাতিও না ঘোড়াও না।

কুকুরেরই বাচ্চা।

এটা নেড়ি ওটা বাঘা

ইয়ে বাত হ্যায় সাচ্চা

হো হো সাচ্চা

শূলপাণির থাপ্পড় খেয়ে লম্বকর্ণ ভেউ করে কেঁদে দৌড় দৌড় দৌড়—হয়তো তেপান্তরের দিকেই। আর গদাধরের লাথি খেয়ে কুম্ভকর্ণ ভ্যাঁ করে একেবারে ভগলু ধোপার কুঁড়ে ঘরে গিয়ে গাঢাকা দিয়েছে। তারপর?

তারপর আর কী? উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপে। গদাধর শূলপাণির ওপর খাপ্পা! ওঁর জন্যেই তো এই হেনস্তা। আর শূলপাণিও রেগে কাঁই। গদাধরের কুম্ভকর্ণকে না দেখলে তো তাঁর লম্বকর্ণ গণ্ডগোলে পড়ত না। দুই বন্ধু এখন আবার গদা ও শূল খুঁজছেন। ভয়ে ঘাট ফাঁকা। পিঁপড়েরাও পা বাড়ায় না।…